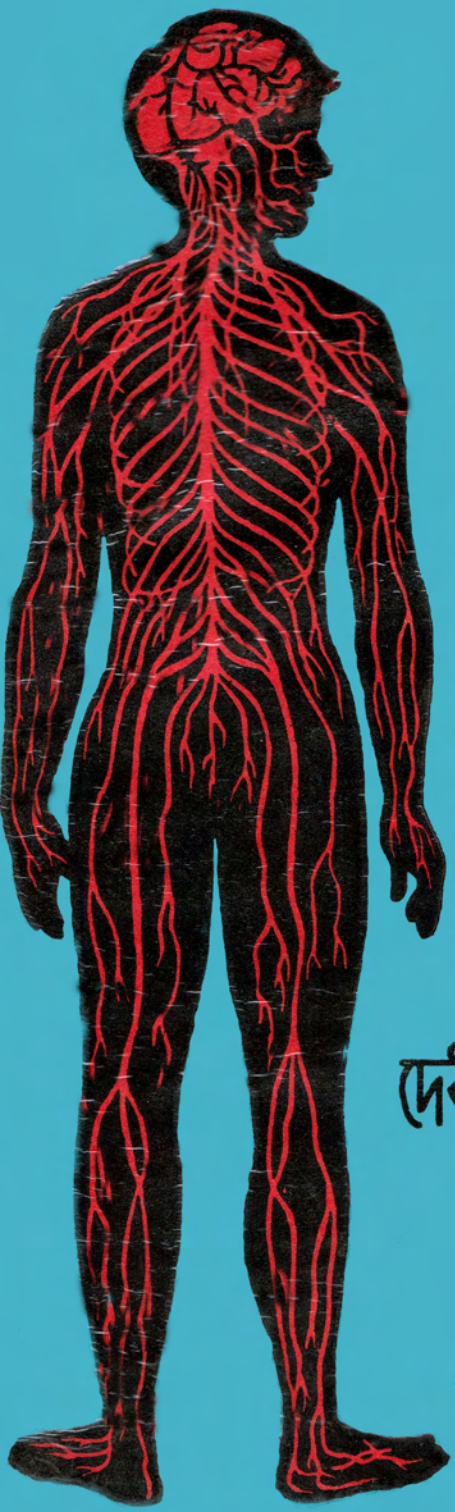

পায়ের নখ থেকে মাথার চুল

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

পায়ের নখ থেকে মাথার চুল

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

PAYER NOKH THEKE MATHAR CHUL
Debiprasad Chattopadhyay

দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ
মে ১৯৯৩
তৃতীয় মুদ্রণ : ডিসেম্বর ১৯৯৮

প্রকাশক
সলিলকুমার গাঙ্গুলি
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ
১২ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক
সমীর দাশগুপ্ত
গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রাঃ লিঃ
৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০১৬

অঙ্গসজ্জা : দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ : শ্রীগণেশ বসু

দাম : ১৫ টাকা

পায়ের নখ থেকে মাথার চুল

Get Bangla eBooks

আরো বাংলা বইয়ের জন্য
নিচের লিংকে
ক্লিক করুন

www.banglabooks.in

নতুন সংস্করণ প্রসঙ্গে

অনেকদিন আগেকার লেখা বই। বছর তিরিশেক তো হবেই; চল্লিশের আশপাশও হতে পারে। যদিও বা অতি কষ্টে ছেঁড়াফোড়া একটা কপি যোগাড় করতে পারলাম, তবুও প্রথম কখন লিখেছিলাম তার তারিখটার নিশ্চিত হদিস পেলাম না।

বলাই বাহুল্য, এতো বছরে বিজ্ঞান যে কী দ্রুত হারে এগিয়েছে তা বুঝতে পারাই কঠিন। যাঁরা বিশেষজ্ঞ তাঁরাই অনেক সময় যেন হিমসিম খেয়ে যান। আগেকার অনেক কথা অবান্তর হয়ে গেছে; এতো নতুন তথ্যের ভিড় যে তার অলিগলির মধ্যে পথ খোঁজাই কঠিন।

তাহলে ওই কয়েক দশকের পুরোনো ঝুড়ঝুড়ে পাতাগুলোকে নতুন করে ছাপাবার তাগিদ কেন? জঞ্জালের সঙ্গে ধুলোর স্তূপে ফেলে দিলেই তো হতো!

কিন্তু ধরে রাখবার একটা যুক্তিও আছে।

ছোটো ছোটো ছেলেপুলেদের জন্যে লেখা বই। বিজ্ঞানের বই। বাংলায় খুব বেশি নেই। লেখার সময় অন্তত আশা ছিল এ-জাতীয় বই বিজ্ঞান-চেতনার দিকে মন টানবে। এই বিজ্ঞান চেতনার গুরুত্ব যে কতখানি তা আমরা দিনের পর দিন খুবই স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছি; মৌলবাদের অন্ধকারে যে-সব দৈত্যদানো ওৎ পেতে আছে তারা ক্রমশই যেন মারমুখো হয়ে উঠছে। বাঁচবার আশাটাই বুঝি কমে আসছে।

মৌলবাদের প্রতিষেধক বিজ্ঞান-চেতনা। তাই এই বই-এর প্রভাবে ছোটো বয়েস থেকে বিজ্ঞান-চেতনার চারাগাছ লালন করার যে-কোনো চেষ্টাই আজ বাঁচবার উপকরণ — কমবেশি যতোটাই হোক না কেন। এই বইতে একটা চারাগাছ রোপণের চেষ্টা। অন্তত চেষ্টাটুকুকে তাচ্ছিল্য করা ঠিক হবে না।

কলকাতা
নভেম্বর ১৯৯২

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

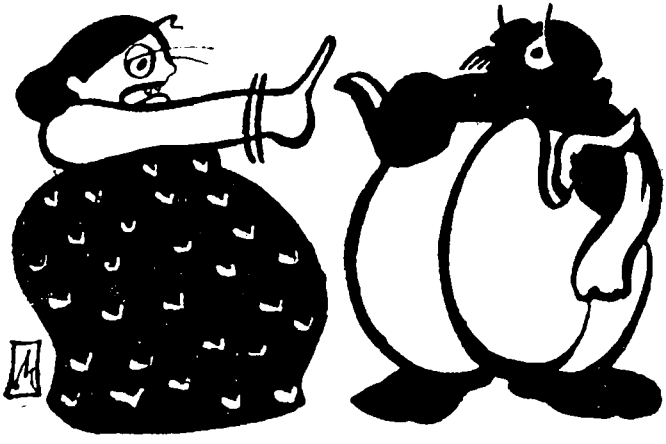

আমাদের বাঁকুড়া শহরে তুমি যদি কোনোদিন পাঠকপাড়া পেরিয়ে কামারপাড়ার দিকে পা বাড়াও তাহলে তোমার হঠাৎ মনে হবে, কাছেপিঠে কোথাও ডাকাত পড়েছে বুঝি ! কিন্তু তল্লাটের লোকজনকে শুধোও, ওরা হেসে বলবে : ও কিছুই নয়, রামপুরের চৌধুরী-বাড়িতে জামাই এসেছে। শুনে তুমি নিশ্চয়ই একেবারে অবাক হয়ে যাবে। কামারপাড়া পেরিয়ে কালিতলা, তারপর রামপুর। তাই সেখানে যদি কারুর বাড়ি জামাই আসে তাহলে কামারপাড়ায় পা দিতে না দিতেই অমন তালা লাগবার যোগাড় হবে কেন ?

আসলে, তুমি যে ওই চৌধুরী-বাড়ির ব্যাপারটাই জানো না ! কর্তা আর গিন্নি মুখোমুখি হলেই প্রলয় কাণ্ড শুরু হয়ে যায়। জামাইকে ঘরে আসতে দেখে কর্তা হয়ত এক মুখ হেসে বলবেন : আহা, বাছা আমার, তিন ক্রোশ পথ পেরিয়ে আসতে কতো কষ্টই না হয়েছে — ওকে একটু বেগুনি ফুলুরি খাওয়ানো যাক। শুনেই গিন্নি একেবারে ফোঁস করে উঠবেন, বলবেন : ভিমরতি আর কাকে বলে ? নিজে অমন ফুলুরি-হ্যাঙলা বলে ফুলুরি দিয়েই কিনা জামাই-আদর ? বাছার জন্যে এখুনি ভুতশহরের জিলিপি আনাতে হবে।

আর তারপর? তারপর শুরু হবে একেবারে রসাতল-তলাতল ব্যাপার — দিনে দুপুরে বাড়িতে ডাকাত পড়ল বুঝি! কর্তা-গিন্নির ঝগড়া থামতে থামতে বেচারা জামাইয়ের না জুটবে ফুলুরি, না জিলিপি। মুখটি চুন করে বসে বসে সে হয়ত নিজেকে ধিক্কার দেবে, ভাববে সেই বুঝি এতো নষ্টের গোড়া। তল্লাটের সবাই কিন্তু বলবে : তা নয়, জামাই না এসে ধোপা এলেও এই কাণ্ড বাধত — এমন কি কেউ যদি না আসত তাহলেও।

কিন্তু কথা হলো, কর্তা-গিন্নির মধ্যে যদি এমনতরো ডাকাতপড়া সম্বন্ধই হয় তাহলে কি তার কোনো প্রতিকার নেই? প্রতিকার বাতলাতে গিয়েছিলেন অনেককাল আগেকার একজন জার্মান ডাক্তার। তিনি বললেন, আসলে দুজনের রক্ত দুরকমের — তাই মিল হয় না। অতএব, এর গা থেকে খানিকটা রক্ত যদি ফুঁড়ে দেওয়া যায় ওর গায়ে তাহলে দুজনের মধ্যে মিটমাট হয়ে যাবে, কেন না দুজনের রক্তই তখন মোটামুটি সমান জাতের হবে।

কিন্তু, এই কথাটা ঠিক, না ভুল? একেবারে ভুল কথা। কেন না দুজনের রক্ত যদি সত্যিই 'খাপ না খায়' তাহলে এর শরীর থেকে ওর শরীরে রক্ত চালান দিতে গেলেই অনর্থ বাঁধবে। আর দুজনের রক্ত খাপ-খাওয়া বলতে বোঝায় একেবারে অন্য ব্যাপার। ঠিক কী বোঝায়, আর কোন কায়দায় তা বোঝা যায় — সে-সব কথা একটু পরেই তুলব। তবে যাই বোঝাক না কেন, তার সঙ্গে মন-মেজাজের মিল হবার কোনো সম্পর্ক নেই। তাই, ঝগড়া-ঝাঁটি হচ্ছে দেখে রক্ত খাপ খাচ্ছে কি না তা আন্দাজ করাই চলে না।

আসলে, ওটা একটা পুরনো আর ভুল ধারণা, যাকে বলে কুসংস্কার। ভুল ধারণাটা হলো, রক্তের মধ্যেই এমন এক আশ্চর্য আর গোপন কিছু লুকনো আছে যার ওপর মন-মেজাজ, স্বভাব-চরিত্র সব কিছু নির্ভর করে। অথচ দেখ, ভুল ধারণাটা আমাদের মনে কী রকম যেন শেকড় গেড়ে রয়েছে। কথায় কথায় আমরা বলি : লোকটা তেজী হবে না, গায়ে যে তার অমুক বংশের রক্ত! কিংবা, ছেলেটা তো চোর-ডাকাত হবেই — রক্তের দোষ যাবে কোথায়? শুধু আমাদের সাধারণ কথাবার্তাই বা কেন? এমন

কাঁচের পাত্রে রক্তের প্লাস্‌মাটা আলাদা হয়ে গিয়েছে। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে যদি নিচের থিতানো জিনিসটা দেখ তাহলে দেখবে তার মধ্যে শুধু জীবকোষ।

কি একেবারে আজকালকার ডাক্তারদের মধ্যেও এমনতরো ভুল ধারণা মাঝে মাঝে দেখা যায়। একটা নমুনা দিচ্ছি। লড়াইয়ের সময় আহত পলটনদের শরীরে প্রায়ই রক্ত ফুঁড়ে দেবার দরকার পড়ে, তাই ডাক্তাররা বোতলের মধ্যে রক্ত মজুত রাখেন। আমেরিকার 'রেড ক্রসে'র কর্তারা গত যুদ্ধের সময় রক্ত মজুত রাখতে গিয়ে নিগ্রোদের রক্ত আর সাদা-চামড়া মার্কিনদের রক্ত আলাদা করে মজুত রাখবার ব্যবস্থা করেন। কী রকম কুসংস্কার দেখো : সাদা-চামড়া মার্কিনদের গায়ে নিগ্রোদের রক্ত চালান করলে বুঝি তাদের রং যাবে! এ প্রায় সেকেলে সেই ডাক্তারদের কথা, যাঁরা মনে করতেন ভেড়ার গায়ে কুকুরের রক্ত চালান করে দিলে ভেড়াটা বদলে বেবাক কুকুর হয়ে যাবে!

আসলে, রক্তের মধ্যে রহস্যজনক আর গোপন শক্তি বলে সত্যিই কিছু লুকনো নেই। তার বদলে ঠিক কী কী আছে আর সেগুলোর কীর্তিকলাপ বা কেমনতরো — এসো সেই সব ব্যাপার ভালো করে দেখা যাক। মনে রেখো, তোমার শরীরের ওজন যদি বিশ সের হয় তাহলে তার মধ্যে প্রায়

এক সের সাড়ে তিন পোয়াই হলো রক্তের ওজন। তার মানে আমাদের শরীরের শতকরা প্রায় ৯ ভাগই রক্তের ওজন।

রক্ত কিন্তু তরল নয়

এমনিতে মনে হয়, রক্ত বুঝি নেহাতই তরল পদার্থ। আসলে কিন্তু তা নয়। নিছক তরল বলতে তার মধ্যে মাত্র শতকরা ৫৫ ভাগ, বাকি ৪৫ ভাগই হলো জীবকোষ। ওই তরল অংশটার নাম দেওয়া হয় প্লাস্‌মা (plasma)। এমনিতে, যদি একটা শিশি বা টেস্ট-টিউবের মধ্যে খানিকটা রক্ত ধরে রাখো তাহলে পরে দেখবে শিশিটা উপুর করে দিলেও রক্ত আর পড়ে যাচ্ছে না, সবশুদ্ধু জেলির মতো জমাট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু যাতে ওরকম ভাবে সবশুদ্ধু জমে না যায় তার ব্যবস্থাও করা সম্ভব, আর সেই ব্যবস্থা করলে খানিক পরে দেখা যাবে শিশির ভেতরকার রক্তটা দুভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে — ওপরে ফিকে হলদে রং-এর প্লাস্‌মা আর নিচে লাল একটা চাপ। রক্তের ভেতরকার জীবকোষগুলো নিচের দিকে থিতিয়ে জমে তৈরি হয়েছে ওই চাপটা — শিশির মধ্যে গঙ্গার ঘোলা জল পুরে রাখলে খানিক পরে যে রকম মাটির দানাগুলো নিচের দিকে থিতিয়ে যায় অনেকটা সেইরকম।

এখন, ওপরকার ওই প্লাস্‌মা বলে তরল জিনিসটির ভেতর শতকরা প্রায় ৯২ ভাগ স্রেফ জল। বাকি ৮ ভাগ হরেক রকমের অন্য সব জিনিস। এই অন্য জিনিসগুলোকে দুভাগে ভাগ করা হয়। একদল যেন প্লাস্‌মার মধ্যে পাকা বাসিন্দে আর একদল নেহাত ভাড়াটের মতো — আসা। যেমন ধরো, শরীরের জীবকোষগুলোর জন্যে রক্ত বয়ে নিয়ে চলেছে অক্সিজেন আর খাবার দাবার। তারপর, খাওয়া-দাওয়ার পর জীবকোষগুলো রক্তের মধ্যে ছিবড়ের মতো কার্বন-ডাই-অক্‌সাইড্‌ ইত্যাদি ফিরিয়ে দিচ্ছে আমরা যখন নিঃশ্বাস ফেলছি তখন ওই কার্বন-ডাই-অক্‌সাইড্‌ ফুসফুস হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে আমাদের শরীর থেকে। তাহলে, প্লাস্‌মার মধ্যে যে খাবারের অণু কিংবা খাবারের ছিবড়ে রয়েছে সেগুলো যাচ্ছে আসছে — ভাড়াটের

মতো। কখনও বা রক্তের মধ্যে তাদের ভিড় বেশি, কখনো কম। এই ধরনের জিনিস আরো নানান রকমের আছে। কিন্তু তাছাড়াও কিছু কিছু জিনিস আছে পাকা বাসিন্দেদের মতো ; তার মানে, তারা ওই রকম যাওয়া আসা করে না।

এ হেন এক পাকা বাসিন্দের নাম হলো ফিব্‌রিনোজেন (fibrinogen)। বৈজ্ঞানিকরা বলেন, জাতিতে সে এক রকমের প্রোটিন (protein)। কিন্তু প্রেটিন কাকে বলে তা তো আমরা এখনো আলোচনা করিনি, তাই প্রোটিন বলে জিনিসটা ঠিক কী তা বোঝাবার জন্যে একটুখানি সবুর করতে হবে। আপাতত জেনে রেখো, তার একটি মূল উপাদান হলো নাইট্রোজেন আর তার নমুনা যদি ভালো করে দেখতে চাও তাহলে ডিমের ভেতরকার স্বচ্ছ অংশটা দেখো — ওটা একরকমের প্রোটিনই। আর জেনে রেখো আমাদের দেহ প্রোটিন ছাড়া গড়াই যায় না, প্রোটোপ্লাস্‌ম্‌ বলে দেহ গড়নের যে মূল উপাদানটির কথা বলেছি তার মধ্যে অনেকটাই হলো এই প্রোটিন। তবে বৈজ্ঞানিকরা বলেছেন, প্রোটিন এক রকমের নয়, হরেক রকমের। আমাদের রক্তের মধ্যেই আজ রকমারি প্রোটিন আর তারই মধ্যে এক রকমের নাম ফিব্‌রিনোজেন। এই ফিব্‌রিনোজেন বলে প্রোটিনটির একটি গুণের কথা বলি।

রক্ত কেন জমাট বাঁধে

ওই ফিব্‌রিনোজেন বলে জিনিসটির কৃপাতেই জমাট বাঁধে আমাদের রক্ত। কেন না, এই জিনিসটিই বদলাতে বদলাতে খুব সূক্ষ্ম সুতোর মতো হয়ে যায়। তার নাম হলো ফাইব্রিন (fibrine)। আর এই ফাইব্রিনের জালে রক্তের জীবকোষগুলো আটকা পড়ে বলেই রক্ত যায় জমাট বেঁধে (clotting)।

কিন্তু রক্তের ভেতরে এ হেন ফিব্‌রিনোজেন তো সব সময়েই রয়েছে। তাহলেও শরীরের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলতে চলতে রক্ত কেন জমাট বেঁধে যাচ্ছে না? তার কারণ, এমনিতে রক্তের মধ্যে গোলা থাকলেও

ফিব্‌রিনোজেন বদলে গিয়ে ফাইব্রিন হয়ে যাচ্ছে না। কিন্তু কেন বদলাচ্ছে না? কেন না, ফিব্‌রিনোজেন তো আর আপনি আপনি বদলায় না, থ্রম্‌বিন্ (thrombin) বলে আর এক রকম জিনিসের পাল্লায় পড়লে তবে বদলায়। কিন্তু থ্রমবিন্-ই বা আসে কোথা থেকে? ওঃ সে এক দারুণ মজার ব্যাপার — যেন, রীতিমতো একটা কারখানার কাণ্ড। থ্রমবিন্ তৈরি হয় প্রোথ্রম্‌বিন্ (prothrombin) বলে একটা জিনিস থেকে, প্রোথ্রম্‌বিন্ তৈরি হয় লিভার বলে অঙ্গটির মধ্যে : লিভারের মধ্যে তৈরি হবার পর প্রোথ্রম্‌বিন্ রক্তের মধ্যে গুলে যায়। কিন্তু প্রোথ্রম্‌বিন্ থেকে কি আপনি-আপনিই থ্রম্‌বিন্ তৈরি হয়? তাও নয়। তার জন্যে আরো দুরকম জিনিস দরকার। এক রকমের নাম হলো ক্যাল্‌সিয়াম (calcium) আর এক রকমের নাম থ্রম্‌বোপ্লাস্‌টিন্ (thromboplastin) অর্থাৎ কিনা ক্যাল্‌সিয়াম আর থ্রম্‌বোপ্লাস্‌টিনের পাল্লায় পড়লে পরই প্রোথ্রম্‌বিন্ বদলে গিয়ে থ্রম্‌বিন হয়। রক্তের প্লাস্‌মায় এমনিতেই রয়েছে ক্যাল্‌সিয়াম।

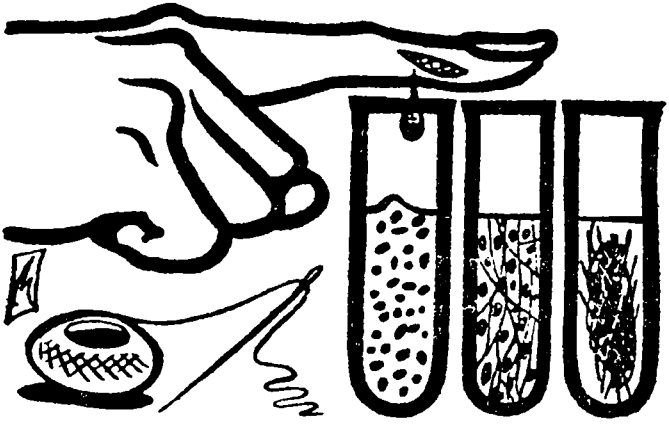

প্লাস্‌মার ভেতরকার ফিব্‌রিনোজেন বদলে ফাইব্রিন হলো আর তারই দরুন রক্ত শেষ পর্যন্ত কী রকম জমাট বাঁধল দেখ।

তাহলে, শেষ পর্যন্ত সমস্যা হলো : থ্রম্‌বোপ্লাস্‌টিন্‌টা আসে কোথা থেকে? সেইটিই তো সবচেয়ে মজার ব্যাপার। আসলে রক্তের মধ্যে লাল

রক্তকণিকা ছাড়াও আরো দুরকম জীবকোষ আছে। তাদের বলে সাদা রক্তকণিকা আর প্লাটিলেট (platilet)। এখন এই দুরকম জীবকোষের মধ্যেই রয়েছে থ্রম্‌বোপ্লাস্‌টিন্‌। কিন্তু এমনিতে বন্ধ অবস্থায় রয়েছে, আবহাওয়ার স্পর্শে এলেই ছাড়া পেয়ে রক্তের মধ্যে মিশতে পারে। তাই শরীরের কোন জায়গা যদি কেটেকুটে যায় তাহলে কাটা জায়গাটার কাছাকাছি যে সব প্লাটিলেট আর সাদা রক্তকণিকারা এসে পড়বে তাদের গা থেকে বেরুতে শুরু করবে থ্রম্‌বোপ্লাস্‌টিন।

তাহলে দেখছ, রক্ত জমাট বাঁধবার আসল রহস্যটা লুকনো রয়েছে রক্তের প্লাস্‌মার মধ্যে — প্লাস্‌মার মধ্যেকার এই ফিব্‌রিনোজেন বলে প্রোটিনের দরুনই তো রক্ত জমাট বাঁধে। তাই রক্তের মধ্যে থেকে যদি জীবকোষগুলো বাদ দিয়ে খালি প্লাস্‌মাটুকু ছেঁকে নাও তাহলে এই প্লাস্‌মাও জমাট বাঁধবে। কিন্তু প্লাস্‌মার মধ্যে থেকে যদি ওই ফিব্‌রিনোজেন বলে প্রোটিনকে বাদ দিয়ে দাও ? তাহলে আর তা জমাট বাঁধবে কেমন করে ? কিন্তু ফিব্‌রিনোজেন-হীন ওই প্লাস্‌মাকে আর প্লাস্‌মা বলা হয় না, তার বদলে বলা হয় সিরাম (serum)। ধনুষ্টঙ্কার বা ডিপ্‌থিরিয়া রোগের ব্যাপারে সিরাম্‌ ইন্‌জেকসন দেবার কথা শুনেছ হয়তো ; "যমের সঙ্গে যুদ্ধ" বলে বইতে আমরাও এ সব কথা তুলেছি।

কিন্তু এত সব জটিল কথাবার্তা শুনে তুমি হয়তো হাই তুলতে শুরু করবে আর বলে বসবে : কী দরকার, মশায়, অতো হাঙ্গামায় ? রক্ত না হয় জমাট নাই বাঁধলো ! ওরে সর্বনাশ ! তাও কি কখনো হয় ? তাহলে আঙুলটা একটুখানি কেটে গেলেই যে কাটা জায়গা দিয়ে গড়িয়ে পড়তে পড়তে শরীরের সবটুকু রক্তই একেবারে খতম হয়ে যাবে। তাই এই জিনিসগুলোর নাম যতোই খটোমটো হোক না কেন তোমাকে বলতেই হবে : ভাগ্যিস্‌ ক্যাল্‌সিয়াম আর থ্রমবোপ্লাস্‌টিনের পাল্লায় পড়ে প্রোথ্রম্‌বিন্‌ বদলে তৈরি হয় থ্রমবিন্‌, তা নইলে ফিব্‌রিনোজেন বদলে ফাইব্রিন হতো না আর তা যদি না হতো তাহলে হাত-পা একটুখানি কেটে গেলেই আমাদের একেবারে ভবলীলা সাঙ্গ হতো।

ঝাড়ুদার সেপাইদের কথা

রক্তের ভেতরকার এই যে সাদা কণা নামের জীবকোষ এদের কিন্তু আরো অনেক গুণাগুণ আছে। শরীরের মধ্যে এরা একাধারে ঝাড়ুদার আর সেপাই এর কাজ চালায়। ঝাড়ুদারের কাজটা কীরকম? ধরো, তোমার রক্তের মধ্যে এমন কিছু গিয়ে পড়েছে শরীরের পক্ষে যার কোন দরকার তো নেই-ই, বরং ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। সাদা রক্তকণিকারা চেষ্টা করবে সেটাকে সাফ করে ফেলতে। কিন্তু সাফ করবার কায়দাটা খুব অভিনব : আবর্জনাটাকে এক জায়গা থেকে ঝেঁটিয়ে আর এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া নয়, তার বদলে স্রেফ গিলে খাওয়া। যেমন ধরো, খুব মিহি করে কাঠকয়লা গুঁড়িয়ে, জলে গুলে একটা জন্তুর চামড়ার নিচে ইঞ্জেকশন করে দিলাম। শরীরের মধ্যে কাঠকয়লার গুঁড়ো আবর্জনা ছাড়া আর কী? তাই এই আবর্জনাটা সাফ করবার জন্যে কিছুক্ষণের মধ্যেই তার আশেপাশে এসে জুটবে অনেক সাদা রক্তকণিকা : কাঠকয়লার গুঁড়ো গিলে খেতে খেতে তাদের শরীরে গুঁড়ি গুঁড়ি কালো দাগ দেখা দেবে।

কিংবা ধরো, পায়ে তোমার কাঁটা বিঁধে গেল। কাঁটা বেঁধবার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের মধ্যে যেন দারুণ হৈ-হুল্লা শুরু হয়ে গেল : বিপদ, বিপদ! আর এই বিপদের সংকেত শুনে রক্তের ভেতরকার সাদা জীবকোষরা পালে পালে জমায়েত হতে লাগল কাঁটাটার চারপাশে।

কিন্তু এই জীবকোষদের শুধুই ঝাড়ুদার মনে করো না। এরা সবাই ফৌজের মতোও। তার মানে, শরীরের মধ্যে থেকে শুধু জঞ্জাল ঝেঁটিয়ে বেড়ানোই এদের কাজ নয়, এরা পারে দারুণ রকম লড়াই করতেও। কার সঙ্গে লড়াই? রোগের জীবাণুদের সঙ্গে। ধরো, কাঁটাটা পায়ে বেঁধবার সময় তার সঙ্গে পালে পালে জীবাণু ঢুকে আমাকে খতম করে দেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ভাগ্যিস ওই সাদা রক্তকণারা আমার রক্তের মধ্যে রয়েছে! তারাও সঙ্গে সঙ্গে পালে পালে বেরিয়ে দারুণ লড়াই শুরু করে দেবে বীজাণুদের সঙ্গে। কী লড়াই! কী লড়াই! কোথায় লাগে কুরুক্ষেত্র। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি জীবাণু যাবে মরে, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সাদা

রক্তকণাও। আর এই সব মৃতদেহের স্তূপই শেষ পর্যন্ত পুঁজ হয়ে বেরিয়ে যাবে আমার শরীর থেকে। লড়াইয়ের চিহ্ন হিসেবে পড়ে থাকবে কাটার দাগটুকু।

আর মজা কি জানো? সাধারণ অবস্থায় রক্তের মধ্যে যতোগুলো সাদা কণা, শরীরের বিপদ-আপদ বাড়লে দেখা যায় তাদের দল ঢের ঢের বেড়ে গিয়েছে। তার মানে বিপদের অবস্থা বুঝে শরীরের মধ্যে তৈরি হয় পালে পালে সাদা রক্তকণা।

লাল রক্ত কণাদের কথা

কিন্তু প্লাটিলেটই বলো আর সাদা জীবকোষই বলো, রক্তের মধ্যে এরা আর কতোই বা? এক ফোঁটা রক্তের মধ্যে সাধারণত মাত্র তিন লাখ থেকে পাঁচ লাখ সাদা জীবকোষ, প্রায় আড়াই কোটি প্লাটিলেট — আর এদের তুলনায় লাল রক্তকণা তো প্রায় তিরিশ কোটি। তার মানে রক্তের ভেতরকার জীবকোষদের মধ্যে এরাই হলো দলে সবচেয়ে ভারী। এদের শরীরে রয়েছে হিমোগ্লোবিন বলে একরকম জিনিস, আর এই হিমোগ্লোবিনের দৌলতে শুধুই যে এদের রং অমন টুকটুকে লাল তাই নয়, এরা পারে শরীরের প্রতিটি জীবকোষের জন্যে ঘাড়ে করে অক্সিজেন বয়ে নিয়ে যেতে। কিন্তু ঝক্কিটা তো সত্যিই কম নয়। ভেবে দেখ একবার : প্রতিটি লাল রক্তকণাকে প্রতি মিনিটে একবার বা দুবার করে দারুণ বেগে শরীরের সমস্ত অলিগুলি ঘুরে আসতে হচ্ছে, দুদণ্ড যে বসে জিরুবে তা একেবারেই সম্ভব নয়। এই দারুণ ঝক্কি বইতে বইতে বেচারাদের পরমায়ু আর কতো দিন টিঁকবে? হিসেব করে দেখা যায়, লাল রক্তকণাদের পরমায়ু ৯০ থেকে ১৫০ দিনের চেয়ে বেশি হতে পারে না। তার মানে, প্রতি মুহূর্তেই তোমার শরীরের মধ্যে অনেক অনেক লাল রক্তকণা মারা যাচ্ছে। কতগুলো করে যে মারা যাচ্ছে তার হিসেব শুনলে তুমি হয়তো আঁতকে উঠবে। বৈজ্ঞানিকেরা হিসেব করে বলেছেন, প্রত্যেক সেকেণ্ডে প্রত্যেকের শরীরের মধ্যে প্রায় এক কোটি করে লাল রক্তকণার মৃত্যু হচ্ছে।

তার মানে, প্রতি দিন কতগুলো করে? প্রতি বছরে কতগুলো করে? হিসেব করতে করতে তুমি নিশ্চয়ই হিমশিম খেয়ে যাবে আর হয়তো ভাববে : রক্তের মধ্যে লাল রক্তকণা যতোই থাকুক না কেন, এইভাবে মরতে মরতে তো কিছুদিনের মধ্যেই তারা সবাই খতম হয়ে যাবে। কিন্তু অমন ভয় পেয়ো না। কেন না আমাদের শরীরের মধ্যে রয়েছে অনেক কারখানা, যেখানে অনবরত লাল রক্তকণা তৈরি হচ্ছে।

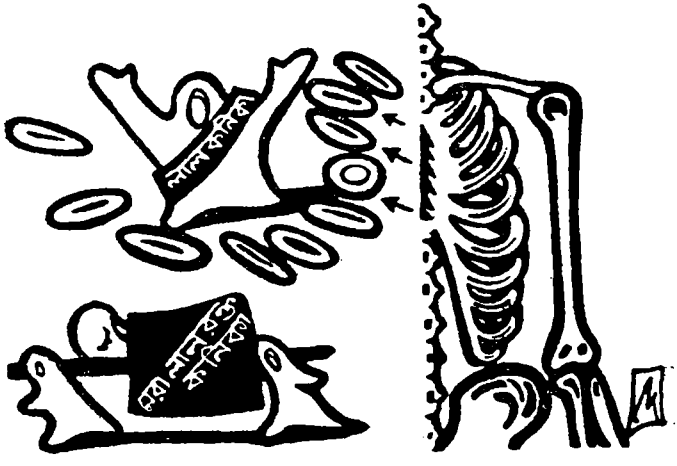

হাড়ের ভেতরে যে-সব জায়গাকে বেশি কালো করে আঁকা হয়েছে সেগুলোই হলো লাল রক্তকণা তৈরি হবার কারখানা। লাল রক্তকণাদের আসল চেহারা গোল গোল পয়সার মতো, মাঝখানটা থ্যাবড়া ধরনের।

কোথায় সেই সব কারখানা? আমাদের হাড়ের মধ্যে। অবশ্য হাড়ের মধ্যে সব জায়গায় নয় — কোন কোন জায়গায় তা ছবি থেকে দেখে নাও।

তাহলে, একদিকে লাল রক্তকণারা যে-রকম অনবরত মরছে অপরদিকে তেমনিই অনবরত জন্ম হচ্ছে নতুনদের। তাই ভয় নেই। তবে ভয় না থাকলেও সমস্যা তো রয়েছেই : ওদের মৃতদেহের স্তূপ নিয়ে সমস্যা! প্রত্যেক সেকেণ্ডেই যদি আমাদের রক্তের মধ্যে প্রায় এক কোটি করে লাল

রক্তকণার মৃতদেহ জমতে থাকে তাহলেই বা চলবে কেমন করে? এই সমস্যার সমাধান যারা করে তুমি তাদের বলতে পারো 'রাক্ষস জীবকোষের' দল। আর, শুনে হয়তো পিলে চমকে যাবে, এই রাক্ষসের দল ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকে তোমার পিলের মধ্যেই।

পিলের ভেতর রাক্ষস !

একজন প্রমাণ মানুষ ঘুঁষি পাকালে তার মুঠোটা যতো বড়ো হয় আমাদের পেটের ভেতরকার পিলেটাও প্রায় ততো বড়োই। জিনিসটা স্পঞ্জের মতো : স্পঞ্জ ভেজালে যেমন তার মধ্যে অনেকখানি জল ভরে যায়, আবার চুপসে দিলে বেরিয়ে যায় জলটা, খানিকটা সেই রকম ভাবেই পিলের মধ্যে ঢুকে রয়েছে বেশ খানিকটা রক্ত। আর আমাদের শরীরের মধ্যে এমনই কায়দার বন্দোবস্ত যে যখনই রক্তের যোগান বেশি দরকার পড়ে তখনই পিলে যেন চুপসে ওই মজুত রক্তটা বেরিয়ে আসে শরীরের জন্যে। অবশ্যই পিলের মধ্যেকার এই যে রক্ত এর মধ্যেও সাধারণ রক্তের মতোই আছে লাল রক্তকণা, সাদা রক্তকণা আর প্লাটিলেট। কিন্তু তাছাড়াও, রয়েছে আর একরকম জীবকোষ। তাদের নাম দেওয়া হয় ম্যাক্রোফেজেস — বাংলা করে তুমি বলতে পার 'পেটুক রাক্ষস' : চেহারায় তারা লাল রক্তকণাদের চেয়ে আটগুণ বড়ো — তাই রাক্ষস আর পেটুক, কেন না পিলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে তারা সাবাড় করে দেয় লাল রক্তকণাদের ছেঁড়া-খোঁড়া মৃতদেহগুলো। তাই, বৈজ্ঞানিকেরা একটু কাব্য করে বলেন : আহা, এই পিলেটি যেন লাল রক্তকণাদের গোরস্থান! কিন্তু কী দারুণ মজার ব্যাপার জান? মড়া বা বুড়োহাবড়া ঘাটের-মড়া ধরনের লাল রক্তকণা যদি এদের সামনে পড়ে তাহলে এই রাক্ষস জীবকোষেরা তাদের গিলে খাবে, কিন্তু তরুণ ধরনের লাল রক্তকণা খাবার দিকে এদের তেমন রুচি নেই। তাই পিলের ভেতরেই এই রাক্ষসদের বাসা হলেও পিলের ভেতরকার তাজা রক্তের পক্ষে কোন ভয়ের কারণ থাকে না।

রকমারি রক্তক্ষয়

রক্তক্ষয় বলে ব্যাপারটা এক রকমের মোটেই নয়। গুণ্ডায় ছোরা মারল, ফিন্‌কি দিয়ে বেরুতে শুরু করলো রক্ত। এ এক রকম। আবার কলার খোসায় আছাড় খেয়ে ধড়াম্ করে পড়লাম — হয়তো কাটল না, বাইরে থেকে একটি ফোঁটা রক্তও পড়তে দেখা গেল না, তবু শরীরের ভেতরকার ধমনী বা শিরা ছিঁড়ে যেতে পারে। তার দরুন যে-রক্তক্ষয় তা তুমি বাইরের থেকে আমার চেহারা দেখে বুঝতে পারবে না। অবশ্য বৈজ্ঞানিকরা এই দুরকম রক্তক্ষয়ের কথা বহুদিন আগেই টের পেয়েছিলেন। তবু, বহুদিন পর্যন্ত তাঁদের কাছে একটা ব্যাপার ছিল একেবারে রহস্যের মতো। যেমন ধর, একটা লোক আগুনে ভয়ানক রকম পুড়ে গিয়ে মারা গেল। অথচ মারা যাবার লক্ষণগুলো দেখলে মনে হয়, হাত-পা কেটে অনেকখানি রক্তক্ষয় হয়ে কেউ যখন মারা যায় তখন তাঁর মৃত্যুর লক্ষণগুলো যে-রকম ঠিক সেই রকমই! রহস্যের মতো নয় কি? বৈজ্ঞানিকদের কাছে এই রহস্যের ব্যাপারটা আরও জটিল হয়ে দাঁড়াল যখন তাঁরা ওইরকম কোনভাবে মরে যাওয়া একজনের শরীরটা কাটাকুটি করে দেখলেন, সত্যিই তার শরীরের মধ্যে থেকে রক্তের পরিমাণ কমে গিয়েছে! ব্যাপারটা কী? অবশ্য বৈজ্ঞানিকেরা বড়ো ধুরন্ধর গোয়েন্দার মতো, সবরকম রহস্যেরই কিনারা করে দিতে চান। আর শেষ পর্যন্ত এইরকম রহস্যজনক মৃত্যুর কিনারা করে তাঁরা বললেন : লোকটা মারা গিয়েছে "শক্" বা shock-এর চোটে! সে আবার কী ব্যাপার? ব্যাপারটা হলো, মাঝে মাঝে দেখা যায় শরীরের ওপরে দারুণ কোন আঘাত লাগলে বা শরীর খুব পুড়ে গেলে বা ওইরকম আরও নানান অবস্থার পর ক্যাপিলারি বা জালক বলে শরীরের ভেতরকার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রক্তের নলগুলো কী রকম যেন বেয়াড়া ধরনের ব্যবহার করতে শুরু করে। তারা ফেটে যায় না, ছিঁড়ে যায় না, কেটে যায় না : তবুও তাদের গা যেন ছাঁদা হয়ে গিয়ে তাদের মধ্যে থেকে রক্তের প্লাস্‌মা বেরিয়ে যায় শরীরের অন্যান্য টিসুগুলোর ভেতর। আর তাই, ধমনী দিয়ে আসা রক্ত ফিরে যেতে পারে না শিরার মধ্যে। ফলে,

হৃৎপিণ্ডটা নিস্তেজ হয়ে আসে, শরীরের মধ্যে রক্ত চলাচল কমে যায়, জীবকোষদের জন্যে অক্সিজেন যোগান আর তেমনভাবে হয় না। শেষ পর্যন্ত অগত্যা লোকটি মারা যায়।

এইখানে আর একটি কথা বলে রাখি : শক্ বা ওই রকমের 'চোরা প্লাস্‌মা-ক্ষয়' অবশ্য সাধারণ রক্তক্ষয়ের দরুনও হতে পারে আর তাছাড়া হঠাৎ-ঘটা বিপদ বা শোক-দুঃখের দরুন যে মানসিক আঘাত বা shock তার সঙ্গে এই জাতীয় প্লাস্‌মা-ক্ষয়ের কোন সম্পর্ক নেই। রক্তপাত তাহলে এক রকমের নয়। কিন্তু সব রকমেরই পরিণামটা শেষ পর্যন্ত এক : মৃত্যু।

তাহলে উপায় ?

শরীর থেকে খুব বেশি রক্তক্ষয় হলেই যদি এমন বিপদ তাহলে নিশ্চয়ই উপায়ও হবে শরীরের মধ্যে খানিকটা রক্ত ফুঁড়ে দেওয়া। তাহলে যে রক্তটা ঘাটতি পড়ছিল সেটা পূরণ হয়ে যাবে। এই উপায়টার কথা বৈজ্ঞানিকদের মাথায় বহুদিন আগে থাকতেই এসেছিল। কিন্তু কাজে খাটাতে গিয়ে দেখা গেল আবার এক রহস্য : রক্তক্ষয়ের দরুন একজন মুমূর্ষু লোকের শরীরে অন্য আর একজনের শরীর থেকে খানিকটা তাজা রক্ত নিয়ে ফুঁড়ে দিলাম — ফলে মুমূর্ষু লোকটির উপকারও হতে পারে, অপকারও হতে পারে। কেননা এমনিতে তার পক্ষে বাঁচবার যেটুকু আশাও বা ছিল তাও এই রক্ত ফুঁড়ে দেবার দরুনই নষ্ট হতে পারে। কেন এই তফাত ?

আগেকার ডাক্তাররা তা আন্দাজ করতে পারতেন না। কিন্তু হালের বৈজ্ঞানিকেরা এই রহস্যের কিনারা করেছেন। আর তাঁরা বলেছেন, সবাইকার সঙ্গে সবাইকার রক্ত খাপ খায় না। তোমার রক্তের সঙ্গে আমার রক্ত খাপ খেতেও পারে, আবার নাও পারে। যদি খাপ না খায় তাহলে তোমার রক্তের মধ্যে আমার রক্ত মিশলে তোমার সর্বনাশ ! আবার আমার রক্তের মধ্যে তোমার রক্ত মিশলে আমার সর্বনাশ। আজকালকার বৈজ্ঞানিকরা অনেক সব পরীক্ষা করে বলছেন, পৃথিবীর সমস্ত মানুষের

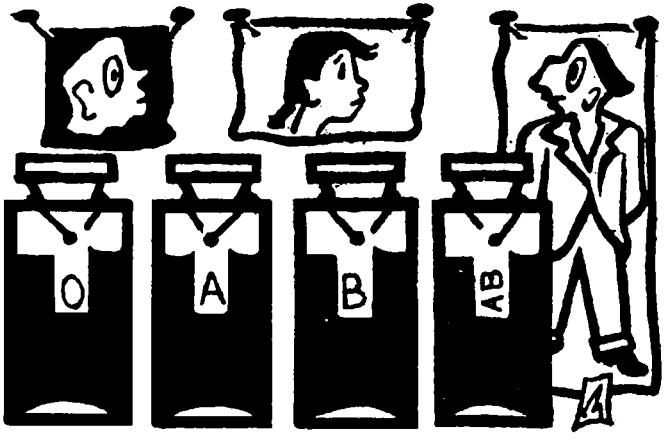

রকমারি রক্ত : পৃথিবীর যে-কোনো দেশের যে কোনো মানুষের রক্তই এই চার রকমের মধ্যে একরকম হতে বাধ্য।

রক্তই মোটের ওপর চার রকমের — তার মানে তোমার আমার বা যে-কোনও লোকের রক্ত এই চার রকমের কোন এক রকম হতে বাধ্য। এই চার রকমের নাম দেওয়া হয় : O,A,B, আর AB। O ধরনের যে রক্ত সেটা অবশ্য বাকি সব রকম রক্তের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়। তাই, তোমার রক্ত যদি O দলের হয় আর আমার রক্ত যদি A দলের হয় আর আমাদের রামতারণের রক্ত যদি হয় B দলের, আর তার মাস্টার মশাইয়ের রক্ত যদি হয় AB দলের তাহলে আমার, রামতারণের কিংবা তার মাস্টার মশাইয়ের — যে কারুর বিপদেই তুমি একটু রক্ত দান করতে পার। কিন্তু A দলের রক্ত B দলের রক্তের সঙ্গে খাপ খায় না, যদিও অনেক ক্ষেত্রেই AB দলের রক্তের সঙ্গে দিব্বি খাপ খেয়ে যায়। এই রকম, নানান রকমের হিসেব-পত্তর। আর কার রক্ত ঠিক কোন দলের তা বের করবার জন্যে রকমারি পরীক্ষাও।

কিন্তু, কথা হলো, খাপ খাওয়া বলতে ঠিক কি বোঝায়? ধরো, একজনের রক্ত হলো A জাতের আর একজনের রক্ত B জাতের। আমি দুজনের শরীর থেকেই একটু একটু রক্ত নিয়ে একসঙ্গে মেশালাম।

মেশাবার পর দেখব, রক্তের কিছু কিছু লাল কণা এক একটা ছোটো ছোটো দলা পাকাতে শুরু করেছে। কিন্তু কতকগুলো লাল কণা এ-রকম ভাবে যদি একসঙ্গে মিলে তালগোল পাকাতে শুরু করে তাহলে তো সর্বনাশ : কেন না, রক্তকে বয়ে চলতে হবে খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধমনীর ভেতর দিয়েও — কোনোটা বা এমনই সূক্ষ্ম .যে তার মধ্যে দিয়ে যাবার সময় লাল রক্তকণাদের পক্ষে সারি বেঁধে একে একে এগুনো ছাড়া উপায় নেই। তাহলে, বুঝতেই পারছ, রক্তের লাল কণাগুলো একসঙ্গে তালগোল পাকিয়ে যাবার বিপদটা কী ! এই তাল-পাকানো রক্তকণার গুঁড়িগুলো সূক্ষ্ম জালকের মধ্যেকার পথ বন্ধ করে দেবে আর তাই বন্ধ হবে সহজ ও স্বাভাবিক রক্ত-চলাচল।

তাই একজনের রক্ত আর একজনের শরীরের মধ্যে ফুঁড়ে দেবার আগে পরীক্ষা করে দেখা দরকার, দুজনের রক্ত ঠিকমতো খাপ খায় কিনা। পরীক্ষার কায়দাটা মোটামুটি কী রকম ? দুজনের রক্তই নুনজলে গুললাম, তারপর একসঙ্গে মেশালাম আর তারপর অণুবীক্ষণের মধ্যে দিয়ে দেখলাম রক্তের লালকণা তালগোল পাকাতে শুরু করেছে কিনা।

এইখানে কিন্তু মনে রাখা দরকার, দুরকমের রক্ত খাপ না খাবার দরুন রক্তের লাল কণাগুলোর এই যে দলা পাকানো, এর সঙ্গে সাধারণ 'রক্ত জমাট বাঁধবার' আকাশ পাতাল তফাত। সাধারণভাবে একজনের রক্ত যখন জমাট বাঁধে তখন তাকে বলে ক্লটিং (clotting)। কিন্তু দুজনের রক্ত খাপ না খাবার দরুন রক্তের লাল কণারা যখন দলা পাকায় তখন তাকে বলে Agglutination বা এ্যাগ্লুটিনেশন্। সাধারণ রক্ত জমাট বাঁধবার (ক্লটিং-এর) রহস্য আগেই বলেছি — এখানে দেখা যাক এ্যাগ্লুটিনেশন্ বলে ব্যাপারটার রহস্য।

তাল পাকাবার রহস্য

এখন ওই এ্যাগ্লুটিনেশন্ বলে ব্যাপারটার রহস্য যদি বুঝতেই চাও তাহলে কিন্তু শুরু করতে হবে আর একটু গোড়ার কথা থেকে। কথা হলো,

রক্তের এই জাত-বিচারটা করা হয় কী করে ? কারুর রক্তকে কেন বলছি A জাতের আবার কারুর রক্তকে কেন বলছি B জাতের ? তা বুঝতে গেলে আবার ওই প্রোটিনের কথা তুলতে হয়। আগেই বলেছি, রক্তের প্লাস্‌মার মধ্যে রকমারি প্রোটিন রয়েছে। কিন্তু শুধু প্লাস্‌মার মধ্যেই নয়; রক্তের লাল কণাগুলোর মধ্যেও রয়েছে প্রোটিন। তবে, সবাইকার রক্তের লাল কণার মধ্যে একই রকম প্রোটিন নয় — রকমারি মানুষের লাল রক্তকণায় রকমারি প্রোটিন। এই সব প্রোটিনগুলোর নামকরণ করা হয় ইংরিজি হরফ দিয়ে : A, B ইত্যাদি। তার মানে, কারুর রক্তের লাল কণায় রয়েছে A নামের প্রোটিন ; তাই জন্যেই তার রক্তকে বলে A জাতের রক্ত। কারুর রক্তের লাল কণায় রয়েছে B জাতের প্রোটিন। তাই তার রক্তের নাম হবে B জাতের রক্ত। আবার কারুর রক্তের লাল কণায় A আর B দুরকমেরই প্রোটিন, তাই তার রক্তের নাম হবে AB জাতের রক্ত। অবশ্য এমন লোকও রয়েছে যার রক্তের লাল কণায় না আছে A না B নামের প্রোটিন ; তাদেরই রক্তকে বলে O জাতের রক্ত। শুধু তাই নয় ; যার রক্তের লাল কণায় যে-জাতের প্রোটিন থাকে তার রক্তের প্লাস্‌মাতেও সেই জাতের প্রোটিন থাকে। তার মানে, তোমার রক্তের লাল কণায় যদি A জাতের প্রোটিন থাকে তাহলে তোমার রক্তের প্লাস্‌মাতেও থাকবে ওই A জাতের প্রোটিনই।

এইবার ভেবে দেখা যাক, A জাতের রক্ত একজনের শরীর থেকে নিয়ে আর একজনের শরীরে ফুঁড়ে দিলাম — যার শরীরে ফুঁড়ে দিলাম তার রক্ত B জাতের। তাহলে ব্যাপারটা কী হবে ? ব্যাপারটা এই হবে যে, যার শরীরে ফুঁড়ে দেওয়া হলো তার রক্তের মধ্যে ছিল B প্রোটিন-ওয়ালা লাল রক্তকণা আর B প্রোটিন-ওয়ালা প্লাস্‌মা, আর তাদের সঙ্গে এসে জুটলো A প্রোটিন-ওয়ালা প্লাস্‌মা আর লাল রক্তকণা। এখন ওই B প্রোটিন-ওয়ালা প্লাস্‌মার সঙ্গে A প্রোটিন-ওয়ালা লাল রক্তকণাদের মোটেই বনে না ; তাই ওই B প্রোটিন-ওয়ালা প্লাস্‌মার পাল্লায় পড়েই A প্রোটিন-ওয়ালা আগন্তুক রক্তকণাগুলো তালগোল পাকাতে শুরু করে। মনে রেখো, দুজনের রক্ত যখন খাপ খাচ্ছে না তখন তালগোল পাকায় আগন্তুক রক্তকণারাই। যে

রক্তকণারা আগে থাকতে শরীরের মধ্যে ছিল তারা তালগোল পাকায় না। তাহলে এবার তুমিই হিসেব করে বলে দিতে পারবে O জাতের রক্ত কেন যে-কোনো লোকের গায়ে নির্ভাবনায় ফুঁড়ে দেওয়া চলে!

আরো সমস্যা আর আরো সমাধান

কিন্তু রক্ত ঠিক খাপ খাচ্ছে কি না তা বুঝতে পারলেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যায় না। প্রথমত, একজনের শরীর থেকে আর একজনের শরীরের মধ্যে সোজাসুজি রক্ত চালান দেওয়া সব সময় সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, ঠিক দরকারের সময়টিতেই এমন লোকও তো সব সময় পাওয়া যায় না যে রক্ত দান করতে রাজী আছে অথচ যার রক্ত রোগীর রক্তের সঙ্গে খাপ খাবে। তাহলে উপায়? একটা 'রক্ত জমা রাখবার' ব্যাঙ্ক খুললে কী রকম হয়? ব্যাঙ্কে যে-রকম সবাইকার টাকা-কড়ি জমা থাকে তেমনি এই রক্তের ব্যাঙ্কে জমা থাকবে রক্ত-দাতাদের রক্ত— আলাদা আলাদা বোতলে আলাদা আলাদা ধরনের রক্ত : কোনোটায় A , কোনোটায় বা B, — এই রকম? অবশ্য হাঙ্গামা আছে। বোতলের মধ্যে রক্ত পুরে রাখলে খানিক পরে রক্তটা জমাট হয়ে যায়। ১৯১৪ সালে ডাক্তার লুই এ্যাগট বলে একজন বৈজ্ঞানিক দেখালেন রক্তের সঙ্গে কিছুটা সোডিয়াম সাইট্রেট কায়দামাফিক মিশিয়ে নিলে রক্ত আর জমাট বাঁধবে না। কিন্তু তবুও সমস্যার অন্ত নেই। শরীর থেকে রক্ত নিয়ে বোতলে পুরে রাখলে রক্তের জীব-কোষরা বড়ো তাড়াতাড়ি মরে যায়। আজকালকার বৈজ্ঞানিকেরা এই সমস্যারও একটা সমাধান করেছেন। ১৯৩২ সাল থেকে সোভিয়েত দেশের ডাক্তাররা রক্ত মজুত রাখবার ব্যবস্থা নিয়ে নানান রকম পরীক্ষা করে চললেন। রক্তের ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করবার কথাটা সব প্রথম ওঁদের মাথাতেই আসে। তাঁরা বললেন, সকলের পক্ষেই নিজের শরীর থেকে কিছু কিছু রক্ত নিয়ম করে এই ব্যাঙ্কে দান করা উচিত; তাহলে বিপদ-আপদের সময় রক্তের অভাবে দেশের মানুষ আর মরবে না। আজকাল অবশ্য প্রায়ই সমস্ত সভ্য দেশেই রক্তের ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সব সময়ই কিন্তু রোগীর শরীরে পুরো রক্ত দেবার দরকার পড়ে না। কেননা, রক্তের মধ্যে রয়েছে তো প্লাস্‌মা আর জীব-কোষ ; প্রায়ই রোগীর শরীরে শুধু প্লাস্‌মা দিলেই তার প্রাণ বাঁচে। বৈজ্ঞানিকরা তাই রক্তের প্লাস্‌মা আলাদা করে নিয়ে রোগীর শরীরে দেবার ব্যবস্থাও করেছেন। শুধু প্লাস্‌মা দেবার একটা মস্ত সুবিধে হলো রোগীর রক্তের সঙ্গে প্লাস্‌মা খাপ খাচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখবার দরকার নেই। যে-কোনো মানুষের রক্তের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়। শুধু প্লাস্‌মা দিলে এ্যাগ্লুটিনেশনের ভয় থাকে না কেন ? কেননা এই হাঙ্গামাটা তো আগন্তুক লাল রক্তকণাদের নিয়েই। তাছাড়া, আমার শরীরে ফুঁড়ে দেওয়া প্লাস্‌মায় যদিই বা বিজাতীয় প্রোটিন আসে তাহলেও আমার লাল রক্তকণারা তালগোল পাকাতে শুরু করবে না কেননা আগন্তুক প্রোটিনটা বিজাতীয় হলেও আমার শরীরের মোট রক্তের তুলনায় নেহাতই তুচ্ছ তার পরিমাণ।

আজকালকার বৈজ্ঞানিকেরা আবার প্লাস্‌মা শুকিয়ে নিয়ে গুঁড়ো করে শ্বাঁতলে ভরে রাখবার ব্যবস্থাও বের করেছেন — রোগীর শরীরে দেবার সময় ডিসটিলড্ ওয়াটারের সঙ্গে সেই গুঁড়ো মিশিয়ে ফুঁড়ে দিলেই হলো !

পেটের ভিতরে চিনির আড়ত

সে প্রায় শ'দুয়েক বছর আগেকার কথা। ক্লড্ বার্নার্ড বলে একজন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করলেন, আমাদের সবাইকারই পেটের ভেতর যেন একটা করে চিনির আড়ত রয়েছে। আর এ-চিনি আজকালকার রেশনে কেনা চিনির মতন যেমন তেমন চিনি নয়—একেবারে বিশুদ্ধ ফলের চিনি, যার বৈজ্ঞানিক নাম হলো কি না গ্লুকোস।

গ্লুকোসের ওই আড়তটিরই নাম হলো লিভার। মাংসর ঝোল খাবার সময় পাতে যদি মেটুলির টুকরো পড়ে তাহলে মনে রেখো ওটা আসলে পাঁঠার পেটের ভেতরকার ওই চিনির আড়তেরই একটা টুকরো, অর্থাৎ লিভারেরই টুকরো। অবশ্য পেটের ভেতরে লিভার বলে যে একটা অঙ্গ আছে সে-কথা বহুদিন আগে থাকতেই বৈজ্ঞানিকদের জানা ছিল। কিন্তু

এই অঙ্গটি যে গ্লুকোসের আড়তের মতো কাজ করে তা আবিষ্কার করলেন ক্লড্ বার্নার্ড।

কেমন করে আবিষ্কার করলেন তাই বলি। আমাদের রক্ত শরীর ঘুরে আসবার সময় লিভারের ভেতর হয়ে আসে। তার মানে, এক দিক দিয়ে লিভারের মধ্যে ঢোকে আর একদিক দিয়ে লিভার থেকে বেরিয়ে যায়। ক্লড্ বার্নার্ড মাপতে শুরু করলেন, রক্তের মধ্যে কতোখানি চিনি আছে। আর মাপতে মাপতে তাঁর চোখে একটা ভারি মজার ব্যাপার ধরা পড়লো। তিনি দেখলেন বেশ একপেট খাবার পর খাবারটা যখন হজম হয়ে রক্তের সঙ্গে মিশছে সেই সময়ে লিভারের মধ্যে ঢোকবার আগে পর্যন্ত রক্তের মধ্যে চিনির পরিমাণ বেশি, আবার লিভার ছেড়ে বেরিয়ে যাবার সময় রক্তের মধ্যে চিনির পরিমাণ কম। তার মানে, লিভার হয়ে আসবার সময় লিভারটা যেন রক্তের ভেতর থেকে খানিকটা চিনি আদায় করে নিলো। আর এই চিনিটা জমা রইলো লিভারের মধ্যে। জমা যে রইলো তার প্রমাণ কী? তার প্রমাণটাও পাওয়া গেল রক্তের মধ্যে চিনি মাপতে মাপতে। ঘণ্টা কতক কিছু না খেলে ক্ষিদেয় যখন পেট চুঁইচুঁই করছে তখন দেখা যায় লিভারের ভেতরে ঢোকবার আগে রক্ততে যে-পরিমাণ চিনি, লিভার ছেড়ে বেরিয়ে যাবার সময় তার চেয়েও বেশি। বাড়তিটুকু এলো কোথা থেকে? ওই আড়তের মধ্যে জমানো ছিল নিশ্চয়ই। আসলে, রক্তের মধ্যেকার চিনিটা আসে খাবার-দাবার থেকে। তাই তুমি যখন ভরপেট খেয়েছো আর খাবারটা হজম হয়ে তোমার রক্তের মধ্যে মিশছে তখন তোমার রক্তের মধ্যে চিনির যোগান গিয়েছে বেড়ে। আর এই বাড়তি চিনির খানিকটা জমা হয়ে থাকছে তোমার লিভারের মধ্যে। আবার অনেকক্ষণ ধরে তোমার পেটে যদি কিছু না পড়ে তাহলে রক্তের মধ্যে থেকে চিনির যোগান যায় কমে। কিন্তু রক্তের মধ্যে থেকে চিনির যোগান কমে গেলে মহা বিপদ। তাই তখন ওই আড়ত থেকে কিছু কিছু চিনি ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা। কিন্তু রক্তের ভেতরে চিনির যোগান কমে গেলে বিপদ বাধবে কেন? তার কারণ, তোমার শরীরটা যে এঞ্জিনের মতন। এঞ্জিনকে চালু করতে হলে কয়লা পুড়িয়ে শক্তির যোগান দরকার। তেমনিই তোমার শরীরকে চালু

রাখতে গেলে দরকার পড়ে শরীরের মধ্যে একটা কিছু পোড়ানোর। শরীরের মধ্যে যে-সব জিনিস পুড়ে আমাদের শক্তি যোগায় তার ভেতর প্রধান হলো চিনি। এই চিনি পোড়ে কেমন করে? কেন, নিঃশ্বাস নেবার সময় আমরা বাইরের থেকে যোগাড় করি অক্সিজেন — চিনির সঙ্গে অক্সিজেন যুক্ত হওয়া মানেই চিনিটা পুড়ে যাওয়া।

কার্বোহাইড্রেট অর্থাৎ কার্বন জল

তাহলে রক্তের মধ্যে যদি চিনির যোগান না থাকতো তাহলে আমাদের শরীর ঠাণ্ডা আর নিস্তেজ হয়ে যেতো। তাই বলে কিন্তু শুধুই মুঠো মুঠো চিনি খাবার দরকার নেই। আলু, ময়দা, চাল ইত্যাদি খেলেও তার ভেতর থেকে প্রচুর পরিমাণে পোড়ানোর মালযোগান দেওয়া হবে। এই জিনিসগুলোকে বলে শ্বেতসার জিনিস বা স্টার্চ (starch)। আর এরা আসলে যেন চিনির বড় ভাই। কেননা, বৈজ্ঞানিকেরা অনেক পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে যতো রকম পঞ্চাশ ব্যঞ্জন সাজিয়েই আমরা খেতে বসি না কেন, সব খাবারের মূলেই শেষ পর্যন্ত রয়েছে তিন রকমের পদার্থ: (১) কার্বোহাইড্রেট বা carbohydrate (২) চর্বি-জাতীয় জিনিস বা fat আর (৩) প্রোটিন বা protein। চর্বি আর প্রোটিনের কথা একটু পরে তোলা যাবে। আপাতত কার্বোহাইড্রেটের কথা সেরে নেওয়া যাক। কার্বোহাইড্রেট আসলে দুরকম: এক চিনি আর এক হলো ওই শ্বেতসার জিনিস। অবশ্য বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, চিনিই একেবারে এক রকমের নয় আবার সব শ্বেতসার জিনিসই এক রকমের নয় — এদেরও রকমারি আছে। কিন্তু সে-সব অনেক জটিল ব্যাপার। আপাতত আমাদের সমস্যা হলো ওই গুরুগম্ভীর নামটি নিয়ে। কার্বোহাইড্রেট — এমনিতে মনে হয় বুঝি দাঁতভাঙা ব্যাপার। অথচ, কথাটার মানে ভেঙে বললেই বুঝতে পারবে কত সহজ অর্থ। কেননা, কার্বোহাইড্রেট কথাটাকে ভাঙলে হয়ে যায় কার্বো (carbo) + হাইডর (hydor)। কার্বো মানে হলো কাঠকয়লা আর হাইডর মানে হলো জল। তাহলে, কার্বোহাইড্রেট — কাঠকয়লা + জল। কিন্তু

কাঠকয়লা বলে জিনিসটা আসলে কার্বন ছাড়া আর কিছু নয়। তাহলে কার্বোহাইড্রেট—কার্বন+জল। আসলে গাছগাছড়ারা বাতাস থেকে কার্বন-ডাই অক্সাইড আর মাটি থেকে জল সংগ্রহ করে তৈরি করে এই কার্বোহাইড্রেট। এখন, ফটোসিনথিসিস বলে একটা ব্যাপার আছে। চিনি আর চাল-ময়দার মতো খটখটে শুকনো জিনিসের মধ্যে বেশ খানিকটা করে জল লুকিয়ে আছে কিন্তু এই কথাটা মানবো কেমন করে? আসলে, কার্বোহাইড্রেটের মধ্যে কার্বনের অণুরা জলের (H_2O) অণুদের এমন সাংঘাতিক জোরে আঁকড়ে রেখেছে যে তাদের আলাদা করতে হলে দারুণ উত্তাপের দরকার পড়ে। তাই, তুমি যদি একটা পাত্রের মধ্যে খানিকটা চিনি কিংবা ময়দা ভরে পাত্রটাকে উনুনে বসিয়ে রাখ তাহলে দেখবে খানিক পরে ওই চিনি বা ময়দা পুড়ে একেবারে অঙ্গার হয়ে গিয়েছে। অঙ্গারটা হলো প্রায় বিশুদ্ধ কার্বন। আর ওই চিনি বা ময়দার ভেতরকার জলটা ইতিমধ্যে উবে গিয়েছে বাষ্প হয়ে। তাই, মাপলেই দেখতে পাবে চিনি বা ময়দার পরিমাণ কমে গিয়েছে।

তাহলে, মোটের উপর কথাটা কী হলো? কথাটা হলো এই, যে গাছগাছড়ারা আমাদের জন্য তৈরি করে দেয় কার্বোহাইড্রেট। কার্বোহাইড্রেট আবার দুরকমের : এক হলো চিনি আর এক হলো চাল-ময়দা ধরনের শ্বেতসার জিনিস। আর আমাদের পক্ষে বেশ খানিকটা করে কার্বোহাইড্রেট খাওয়া দরকার। কেননা, আমাদের শরীরকে চালু রাখবার জন্যে শরীরের মধ্যে শক্তির যোগান চাই, শক্তি পেতে গেলে একটা কিছু পোড়াতে হবে আর যে-সব জিনিস পুড়িয়ে শরীরের মধ্যে শক্তির যোগান সম্ভব তাদের ভেতর প্রধান হলো কার্বোহাইড্রেট। আমাদের রক্ত শরীরের জীবকোষের কাছে বয়ে নিয়ে চলেছে কার্বোহাইড্রেটের অণু আর তাছাড়াও অক্সিজেনের অণু। জীবকোষেরা দুটোকে মিশিয়ে, — অর্থাৎ কিনা, কার্বোহাইড্রেট পুড়িয়ে, কেননা অক্সিজেনের সঙ্গে মেশা মানেই হলো পুড়ে যাওয়া, — শরীরের জন্যে শক্তি যোগান দেয়।

তাই, খাবার-দাবার খাওয়ার সময় মনে রাখতে হবে এমন খাবার খাওয়া দরকার যার মধ্যে বেশ খানিকটা করে কার্বোহাইড্রেট আছে। কী কী

খাবারের মধ্যে কতখানি করে কার্বোহাইড্রেট যে আছে তা একটু পরেই ছক কেটে আর ছবি এঁকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে।

নেয়াপাতি ভুড়ির রহস্য

কিন্তু শরীরের মধ্যে শক্তি যোগানোর জন্য শুধু যে কার্বোহাইড্রেট পোড়াবার ব্যবস্থা তাই নয়। কার্বোহাইড্রেট ছাড়াও, চর্বি কিংবা ফ্যাট পুড়িয়েও শক্তির যোগান হয়। শুধু তাই নয়। বরং ফ্যাট বা চর্বিজাতীয় জিনিস পুড়িয়েই শক্তির যোগানটা হয় বেশি। কেননা, পোড়াবার মাল হিসাবে চর্বিটা অনেক আঁট-সাঁট ধরনের জিনিস। কার্বোহাইড্রেটের মধ্যে অনেকটাই তো জল, চর্বির মধ্যে জল নেই। তবুও কিন্তু চর্বির মধ্যে আছে কার্বন, হাইড্রোজেন আর সামান্য পরিমাণে অক্সিজেন। কয়েক রকম চর্বিজাতীয় জিনিস আমরা যোগাড় করি জীববস্তুদের কাছ থেকে। যেমন ধরো : মাখন, ঘি, চর্বি, ডিমের হলদে অংশটার ভেতরকার ফ্যাট। আবার

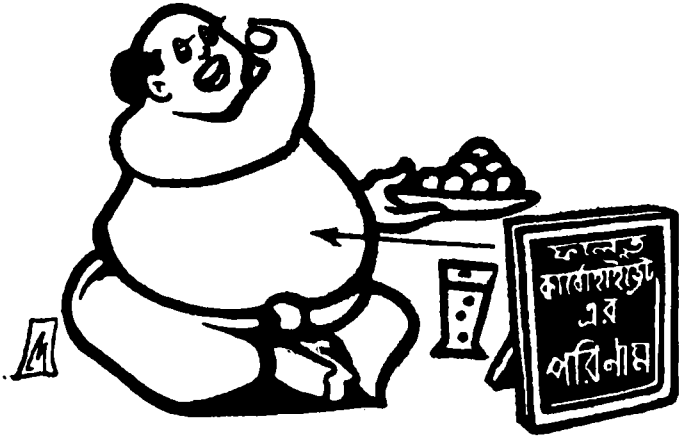

বেশি খেলেও বিপদ, কম খেলেও বিপদ। খাওয়া নিয়ে হিসেবটা কী করে করতে হয় সে কথা একটু পরেই বলবো।

গাছ-গাছড়াদের কাছ থেকেও আমাদের পক্ষে রকমারি ফ্যাট যোগাড় করা সম্ভব। যেমন ধরো : সর্ষের তেল, অলিভ তেল ইত্যাদি। কিন্তু চর্বিজাতীয় জিনিস যোগাড় করবার আরো মজাদার এক কায়দা আছে, আর কায়দাটা

আছে আমাদের শরীরের মধ্যেই। ধরো, তুমি খুব বেশি কার্বোহাইড্রেট খেতে লাগলে — শরীরের জন্যে যতোখানি পুড়িয়ে শক্তির যোগান দেওয়া দরকার তার চেয়েও বেশি। তখন হবে কি জানো? ওই ফালতু কার্বোহাইড্রেট শরীরের মধ্যে বদলাতে বদলাতে তোমার শরীরের চর্বি হয়ে যাবে। এই চর্বিটা থাকবে কোথায়? প্রধানত, চামড়ার ঠিক তলাতেই। তাহলে বুঝতেই পারছ, ভুঁড়ি গজাবার আসল রহস্যটা কী। যতোটা কার্বোহাইড্রেট শরীরের পক্ষে দরকার তার চেয়েও বেশি খেতে শুরু করলে চামড়ার তলায় তা চর্বি হয়ে জমতে থাকবেই! কিন্তু তাই বলে, ভুঁড়ির ভয়ে চর্বিজাতীয় জিনিস খাওয়া কমাতে যেও না, তাহলে শেষ পর্যন্ত মারা পড়বার ভয়। মনে রেখো, আমাদের শরীরের জন্যে তিন রকমের খাবারই দরকার : কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট আর প্রোটিন। তবে, হিসেব করে খেতে হবে, শরীরের জন্যে যেটা যতোখানি দরকার ততোখানি করেই। বেশি খেলেও বিপদ, কম খেলেও বিপদ। খাওয়া নিয়ে হিসেবটা কী করে করতে হয় সে কথা একটু পরেই বলবো।

প্রোটিনের কথা

কার্বোহাইড্রেট আর ফ্যাট-এর কথা না-হয় বোঝা গেল। কিন্তু প্রোটিন আবার কী? আর, খাবার-দাবার থেকে আমাদের শরীরের জন্যে কিছু কিছু প্রোটিন যোগাড় করা দরকারই বা কেন? এই দ্বিতীয় প্রশ্ন থেকেই শুরু করা যাক। আমাদের শরীরকে তো বলেছি অনেকটা এঞ্জিনের মতো। এঞ্জিন চলতে চলতে ক্ষয়ে যায়, তাই নিয়ম করে তাকে মেরামত করা চাই। আমাদের শরীরের বেলাতেও এই কথা। শুধু তাই নয়। এঞ্জিনের সঙ্গে একটা তফাতও আছে। এঞ্জিন তো আর লম্বায় চওড়ায় বাড়ে না অথচ আমাদের শরীর দস্তুরমতো বড়ো হয়। তাহলে, শরীরকে মেরামত করবার জন্যে আর বড়োসড়ো করবার জন্যে এক রকম মালমশলা লাগবে। এই মালমশলা বলতে প্রধানত হলো প্রোটিন। কেননা, আমাদের সবাইকার শরীরই শেষ পর্যন্ত প্রোটোপ্লাস্‌ম্‌ দিয়ে গড়া আর এই

প্রোটোপ্লাস্‌ম্‌-এর মধ্যে প্রধানতই রয়েছে প্রোটিন। তাহলে, খাবার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন খাবারের মধ্যে থেকে প্রোটিনের ঘাটতিও না পড়ে।

কিন্তু প্রোটিন বলে জিনিসটা ঠিক কেমনতরো ? ডিমের ভেতরকার স্বচ্ছ অংশটা দেখেছ ত ? ওর মধ্যে জল আর প্রোটিন ছাড়া বিশেষ কিছুই নেই। তবে, রসায়ন-বিজ্ঞানের ভাষায় যদি প্রোটিনের বর্ণনা চাও তাহলে বলবো, প্রোটিন হলো নাইট্রোজেনওয়ালা খাবার! অর্থাৎ, কার্বোহাইড্রেট আর ফ্যাটের মধ্যে নাইট্রোজেন নেই, শুধু প্রোটিনের মধ্যে রয়েছে।

ক্যালোরি আবার কী ?

তাহলে, কার্বোহাইড্রেট আর ফ্যাট পুড়িয়ে শরীরের জন্য শক্তির যোগান দেওয়া। শক্তি বলে জিনিসটা যেন বহুরূপীর মতো : কখনো বা সে তাপের

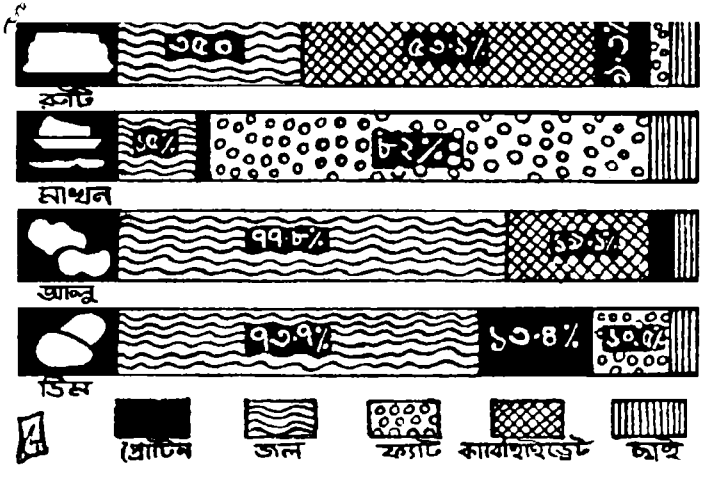

(heat) রূপ নেয়, কখনো বা অন্য রকমের। শরীরের ভেতর ওই দুরকম মাল পুড়িয়ে যখন শক্তি পাওয়া যায় তখন তার রূপটা তাপের মতো!

এখন প্রশ্ন হলো, তাপকে মাপা যায় কেমন করে ? থার্মোমিটার দিয়ে। দুরকম হিসেব—ফারেনহাইট আর সেন্টিগ্রেড। কিন্তু এখন একটা অন্য প্রশ্ন করি। ধরো, একটা বাটিতে এক বাটি বরফ জল রয়েছে। তার উত্তাপ তো

শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। বাটি-ভরতি জলটা উনুনে চাপিয়ে দিলাম, খানিক পরে ফুটে উঠলো। তখন তার উত্তাপ হলো একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এক বাটি জলের উত্তাপ একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বেড়ে গেল। কিন্তু তার জন্যে কতোটা তাপ লাগলো? ধরো, এক মুঠো কয়লা পোড়াবার দরকার হলো। কিন্তু বাটি-ভরতি বরফ জল না হয়ে যদি বালতিভরতি বরফ জল হতো? তাহলে এক মুঠো কয়লা পোড়ানোর তাপ যুগিয়ে পুরো বালতির জলের উত্তাপ একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বাড়ানো যেতো না। আরো, কয়লা পোড়াবার দরকার হতো। তার মানে, যোগান দিতে হতো আরো অনেকখানি বেশি পরিমাণ তাপের। তাহলে তাপেরও পরিমাণ বলে একটা ব্যাপার আছে। একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে যে-পরিমাণ তাপ পাওয়া যায়, এক উনুন কয়লা পুড়িয়ে নিশ্চয়ই তার চেয়েও ঢের বেশি পরিমাণ তাপ পাবার কথা। আর তাই সমস্যা হলো, তাপের পরিমাণটা মাপবার কী কায়দা করা যায়? চালডালের মতো ঘন পদার্থের পরিমাণ মাপবার হিসেব আমাদের জানা আছে, তেল-দুধের মতো তরল পদার্থের পরিমাণও আমরা মাপতে শিখেছি। কিন্তু তাপের? বৈজ্ঞানিকেরা তাপের পরিমাণ মাপবারও এক রকম হিসেব বের করেছেন। আর তাঁরা সেই হিসেবটা বলবার সময়েই বলেন ক্যালোরির কথা।

তাহলে ক্যালোরি কাকে বলে? সের কিংবা পাউণ্ডের মতোই একটা মাপের নাম হলো ক্যালোরি। এক ক্যালোরি মানে কী? শরীর-বিজ্ঞানের বেলায়, এক ক্যালোরি তাপ বলতে বোঝায় সেই পরিমাণ তাপ যা দিয়ে এক গ্রাম জলের এক ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উত্তাপ বাড়ানো যায়।

তাহলে, খাওয়ার সময়ে একটু হিসেব করে খেতে হবে, শরীরকে চালু রাখবার জন্যে যতোখানি তাপ দরকার খাবার-দাবার থেকে ঠিক যেন ততোটারই সরবরাহ হয়। তার চেয়ে বেশি খেলে ফালতু খাবার থেকে ভুঁড়ি গজাবে, তার চেয়ে কম খেলে রোগা হয়ে যাবে। তাহলে প্রশ্ন হলো, শরীরের জন্যে কি পরিমাণ তাপের সরবরাহ দরকার? মোট কতো ক্যালোরি? অবশ্য এক কথায় এর জবাব দেওয়া যায় না। ব্যাপারটা নির্ভর করছে কাজকর্মের ধরনধারণের ওপর। যারা গতর খাটায় বেশি তাদের

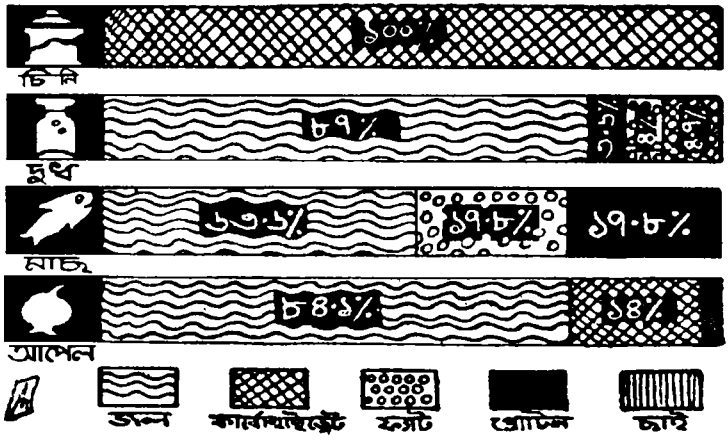

জন্যে বেশি ক্যালোরির দরকার, যারা গতর খাটায় কম তাদের পক্ষে তুলনায় কম ক্যালোরি তাপ হলেই হবে। যেমন ধরো, নৌকোর মাঝি সারাদিন দাঁড় টানছে, তাই তার খাবারদাবারের মধ্যে প্রায় চার-সাড়ে-চার হাজার ক্যালোরির যোগান দরকার। কিন্তু আপিসের বাবুর বেলায় মোটেই তা নয়; তার পক্ষে প্রায় হাজার তিনেক ক্যালোরি হলেই হবে।

লোহা-লক্কড় খাবে নাকি ?

কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট আর প্রোটিন—এ-ছাড়াও কিন্তু শরীরের জন্যে খাওয়া দরকার খুব সামান্য পরিমাণে ক্যাল্‌সিয়াম (calcium) লোহা (iron) ,নুন, ফস্‌ফরাস ইত্যাদি। ক্যাল্‌সিয়াম আর ফস্‌ফরাস প্রধানত দরকার শরীরের হাড়গোড়গুলোকে মজবুত করবার জন্যে, লোহা দরকার রক্তের হিমোগ্লোবিনের জন্যে, তেমনি আরো নানান উদ্দেশ্যে দরকার কিছু কিছু তামা, দস্তা, ইত্যাদি। কিন্তু ভয় নেই। লোহা-লক্কড় চিবিয়ে খেতে হবে না। কেননা আমরা সাধারণত যে-সব খাবার-দাবার খাই তার মধ্যেই আছে এই জাতীয় জিনিস, তবে এমনভাবে লুকিয়ে আছে যে তুমি তা টের পাও না। যেমন ধর, দুধের মধ্যে ক্যাল্‌সিয়াম লুকোনো আছে,

রকমারি ফলের মধ্যে লুকোনো আছে আয়রন—এ সব ব্যাপার কি দুধ দেখে বা ফল দেখে বুঝতে পার? তাই, শাক-সব্জি, ফল-দুধ, ডিম-মাছ ইত্যাদি ঠিক নিয়ম করে খেলে সেগুলোর মধ্যে থেকেই শরীরের জন্যে এই সব লোহা-লক্কড়ের যোগান হবে। তবে কখনও কখনও অসুখ-বিসুখের দরুন শরীরের ভেতর এসবের ঘাটতি পড়ে আর তাই তখন ডাক্তার ওষুধ হিসেবে এগুলো আমাদের খাওয়াতে চান।

আরো একটা জরুরী কথা মনে রেখো, শরীরের মধ্যে শতকরা ৭৫ থেকে ৮০ ভাগই হলো জল— স্রেফ জল। আর অনবরতই আমাদের শরীর থেকে নানানভাবে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। তাই, তুমি যদি যথেষ্ট পরিমাণে জল না খাও তাহলে শরীরের মধ্যেকার জল যাবে কমে আর তুমি পড়বে বিপদে।

পাতিলেবু মার্কা নাবিক !

ইংরেজ নাবিকদের এককালে নাকি বলা হতো limcy, সোজা বাংলায় বলতে গেলে কথাটার মানে দাঁড়ায় পাতিলেবু-মার্কা নাবিক। কিন্তু এমন উদ্ভট নাম কেন? তার কারণ ইংরেজ নাবিকেরা সমুদ্রযাত্রার সময়ে সঙ্গে করে বেশ কিছুটা লেবুর রস নিয়ে যেত।

কিন্তু সমুদ্রযাত্রার সময় থেকে-থেকে লেবুর রসই বা কেন? তার কারণ একটা ব্যায়রামের ভয়। ব্যায়রামটার নাম হলো স্কার্ভি। বড় সাংঘাতিক ব্যায়রাম : দাঁতের মাড়ি দিয়ে দরদর করে রক্ত পড়ে, হাত-পায়ে গাঁটগুলো যায় ফুলে, আর শেষ পর্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে রোগীর মৃত্যু হয়। আগেকার কালে, দীর্ঘ দিন ধরে সমুদ্রযাত্রা করবার সময় নাবিকদের মধ্যে প্রায়ই এই ভয়াবহ রোগ দেখা দিত। কিন্তু কেন, তা কেউ জানত না। কেবল ইংরেজ নাবিকরা এইটুকু ব্যাপার দেখতে পেল যে সমুদ্রের বুকে দিনের পর দিন কাটাবার সময় একটু একটু করে পাতিলেবুর রস খেলে স্কার্ভি আর হয় না। কিন্তু কেন যে হয় না তা জানা ছিল না।

স্কার্ভি রোগ কেন হয় আর পাতিলেবুর রসের মধ্যে এমন কী জিনিস

আছে যার দরুন এই রোগের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায়, এ সব কথা জানতে পারা গিয়েছে সম্প্রতি। আর মজার কথা হলো, একেবারে অন্য একরকম রোগ নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে এই সব প্রশ্নের আসল উত্তর পাওয়া গেল।

অন্য রোগটার নাম হলো, বেরিবেরি। প্রধানত ভারতবর্ষ, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশগুলিতেই এই বেরিবেরি বলে রোগ দেখা দিত। আর পরীক্ষা করতে করতে দেখা গেল, বেরিবেরি রোগের আসল কারণটা হলো কলেছাঁটা চাল খাওয়া। কেননা, কলে ছাঁটবার সময় চাল থেকে খোসার সঙ্গে বেরিয়ে যায় একটি মহামূল্যবান জিনিস আর খাবার-দাবারের মধ্যে থেকে এই জিনিসটির ঘাটতি পড়লে দেখা দেয় বেরিবেরি। ওই মহামূল্য জিনিসটিরই নাম হলো ভাইটামিন। আজকাল অবশ্য জানা গিয়েছে, ভাইটামিন এক রকম নয়, হরেক রকমের। A. B. C. D. ইত্যাদি ইংরিজি হরফ দিয়ে তাদের নামকরণ করা হয়। খাবার-দাবারের মধ্যে থেকে এক

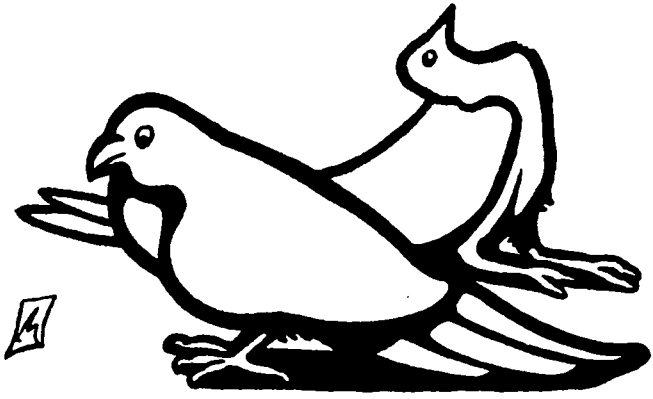

ভাইটামিন B-র অভাবে মানুষের যেমন বেরিবেরি রোগ হয় পায়রাদেরও তেমনি একটি অসুখ করে, অসুখটার নাম হলো পলিনিউরাইটিস। ছবিতে ওপাশের পায়রাটার অসুস্থ অবস্থা, সামনের দিকে দেখো ভাইটামিন B^1 খাইয়ে মাত্র একটি ঘণ্টার মধ্যেই তার কী রকম হাল ফেরানো হয়েছে।

এক রকমের ভাইটামিনের অভাব হলে এক এক রকম রোগ হয়। কোন খাবারের মধ্যে কী কী ভাইটামিন তা পরের ছক থেকে দেখে নিও। কিন্তু মনে রেখো খাবার-দাবারগুলো তাজা হওয়া দরকার।

তাহলে, ওই পাতিলেবু-মার্কা নাবিকদের ব্যাপারটা এতোক্ষণে বুঝলে তো? দিনের পর দিন সমুদ্রের বুকে ভেসে বেড়াবার সময় তাজা সব্জি-টব্জি জুটবে কী করে? তাই খাওয়া দাওয়ার মধ্যে ভাইটামিনের অভাব। যে ভাইটামিনটির অভাবের দরুন স্কার্ভি রোগ তার নাম হলো C। আর পাতিলেবুর রসের মধ্যে ভাইটামিন "সি"-র প্রচুর যোগান। অবশ্য, ওই নাবিকেরা এ কথা মোটেই জানত না।

কিন্তু তুমি যদি প্রশ্ন কর, ভাইটামিন বলে জিনিসটা আসলে কী, তাহলে বড় মুশকিলে পড়ব। কেননা এ নিয়ে আজও গবেষণা চলেছে, আর বৈজ্ঞানিকেরা এখনো এক কথায় ও-প্রশ্নর কোন জবাব দিতে চাইছেন না। তবে মোটের ওপর বলা যায়, ভাইটামিন ঠিক খাদ্য নয়। কেননা অত্যন্ত সূক্ষ্ম পরিমাণে ভাইটামিন হলেই আমাদের শরীর সন্তুষ্ট। কেউ কেউ বলছেন, এই ভাইটামিন যেন খাবার-দাবারের চাবিকাঠি, তাই খাবার-দাবারের সঙ্গে একটু আধটু ভাইটামিন যদি পেটে না পড়ে তাহলে খাবার-দাবারগুলো আমাদের শরীরের মধ্যে চাবিবন্ধ অবস্থায় থেকে যায়, শরীরের কাজে আর আসে না। সে যাই হোক না কেন, একটা কথা মনে রেখো। স্বাভাবিক আর তাজা খাবার-দাবারের মধ্যেই শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় যথেষ্ট ভাইটামিনের যোগান রয়েছে। তবে, নেহাত রোগ-ভোগ হলে ডাক্তারবাবু হয়তো ওষুধ হিসেবে আলাদা করে কোন রকম ভিটামিনের বড়ি তোমায় খেতে বলতে পারেন।

খাওয়া-দাওয়ার হিসেব নিয়ে কয়েকটি ফর্দ

১। রকমারি মানুষের জন্যে রকমারি ক্যালোরি দরকার কার জন্যে কত?

সাধারণ বয়স্ক লোক	
—মাঝারি রকম শারীরিক শ্রম করলে	৩৫০০
—কমসম শারীরিক শ্রম করলে	৩১৫০
১৫ বছর বয়সের ছেলে ঃ কুঁড়ে ধরনের	২৮০০
১৫ বছর বয়সের মেয়ে ঃ মাঝারি খাটুনি	২৮০০
তের-চোদ্দ বছরের ছেলে	২৮০০
পনের-ষোল বছরের মেয়ে	২৮০০

১২ বছরের ছেলে	২৪৫০
তের-চোদ্দ বছরের মেয়ে	২৪৫০
দশ-এগারো বছরের ছেলে	১৮০০
দশ-বারো বছরের মেয়ে	১৮০০

২। কী উদ্দেশ্যে কোন ভাইটামিন দরকার আর কী কী খাবারের মধ্যে তার যোগান আছে

ভিটামিনের নাম	উদ্দেশ্য	কোন খাবারের মধ্যে সবচেয়ে ভালো যোগান
A	শরীরের বাড়। রকমারি চোখের অসুখ বন্ধ করে। অল্পে ছোঁয়াচ লাগার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ জাগায়। স্নায়ুতন্ত্রকে সাহায্য করে।	কডলিভার তেল, মাখন, লঙ্কা, উচ্ছে, বাঁধাকপি, শালগম, ডিমের হলদে ভাগ (কুসুম), আড়, চিতল, ইলিশ, ভেটকী মাছ, দুধ, টমেটো, নোটে শাক, পালং শাক, মাংসের মেটুলি ইত্যাদি।
B	শরীরের বাড়। ক্ষিদে। হজম। বেরিবেরি প্রতিষেধক। স্নায়ুতন্ত্রকে সাহায্য করে।	ডিমের কুসুম, দুধ, কড়াইশুঁটি, টমেটো, বরবটি, চালের কুঁড়ো, আটা, ডাল, গুড়, চিনেবাদাম, মেটুলি ইত্যাদি।
C	স্কার্ভিরোগের প্রতিষেধক। মজবুত দাঁত ও হাড়। রক্তের নলিগুলির স্বাস্থ্য। শরীরের বাড় ও শক্তি।	কমলালেবু, নাসপাতি, পাতি-লেবু, কড়াইশুঁটি, টমেটো, কাঁচা শাকসব্জি ইত্যাদি।
D	মজবুত হাড়। ভালো দাঁত। রিকেট রোগের প্রতিষেধক।	কডলিভার তেল, ডিমের কুসুম ইত্যাদি।

Gশরীরের বাড়, ভালো ক্ষিদে। মেটুলি, গাজর, দুধ, ডিম
পেলাগ্রা রোগের প্রতিষেধক। ইত্যাদি।

৩। কী উদ্দেশ্যে কোন খনিজ পদার্থ দরকার এবং কী কী খাবারের মধ্যে তা পাওয়া যায়

খনিজ পদার্থর নাম	কেন দরকার	কোন খাবারে যোগান
	মজবুত হাড়	দুধ
ক্যাল্‌সিয়াম্	ভালো দাঁত রিকেট রোগের প্রতিষেধক স্নায়ুতন্ত্রের স্বাস্থ্য	ডিমের কুসুম বরবটি কফি মটর
ফস্‌ফরাস্	মজবুত হাড় ভালো দাঁত শরীরের টিসু গড়া রিকেট রোগের প্রতিষেধক	ডিমের কুসুম মটর, বরবটি, গাজর, কড়াইশুঁটি, দুধ, চকোলেট, মেটুলি
লোহা	রক্তের জন্যে	মেটুলি, মটর,কড়াই- শুঁটি, শাকসব্‌জি
আইয়োডিন	থাইরয়েড গ্রন্থির কাজ (৪১ পৃষ্ঠা দেখো)	সমুদ্রের মাছ, আয়োডিন যুক্ত নুন ইত্যাদি।

৪। কোন খাবার কতোখানি করে খেলে তার থেকে প্রায় ১০০ ক্যালোরি উত্তাপ পাওয়া যাবে

খাবারের নাম	পরিমাণ (আউন্স-এর হিসেব)
মাছ-মাংস (রান্না অবস্থায়)	
ভেড়া বা পাঁঠার মাংস	১·৮
মাছ	১·২
চিকেন (মুরগি)	৩·২
শাকসবজি ও ফল	
টাটকা শাকসবজি (কাঁচা)	১১
রান্না পেঁয়াজ	৮·৪
মটরশুঁটি	৬·৩
আলু (সেদ্ধ)	৩·০৫
টমেটো	১৫
আপেল (দুটো)	৭·৩
কলা (একটা বড়ো কলা)	৩·৫
কমলালেবু (একটা বড়ো লেবু)	৯·৪
দুধ, ডিম, মাখন ইত্যাদি	
মাখন	·৪৪
ঘোল (মাখন তোলা)	৯·৭
দুধ (ছোটো গেলাস)	৪·৯
মুরগির ডিম (১টা)	২·১
ভাত, মিষ্টি ইত্যাদি	
চিনি	·৮৬
বাদাম	·৫৩
ভাত	৩·১

৫ । কোন কোন খাবারের মধ্যে শতকরা কী কী পরিমাণ বিভিন্ন জিনিস আছে তার নমুনা

খাবারের নাম	জল	প্রোটিন	চর্বি	কার্বোহাইড্রেট
মুরগির মাংস	৪৩·৭	১২·৮	১·৪	
মাছ	৫০·৭	১২·৮	৭	
ডিম	৬৫·৫	১৩·১	৯·৩	
মাখন	১১·০	১	৮৫	
দুধ	৮৭·০	৩·৩	৪·০	৫·০
সাদা রুটি	৩৫·৩	৯·২	১৩	৫৩·১
বরবটি	৮৩·০	২·১	·৩	৬·৯
শাকসবজি	৭৭·৭	১·৪	·২	৪·৮
টমেটো	৯৪·৩	·৯	·৪	৩·৯
আলু	৬২·৬	১·৮	·১	১৪·৭
আপেল	৬৩·৩	·৩	·৩	১০·৮
কলা	৪৮·৯	·৮	·৪	১৪·৩
কমলালেবু	৬৩·৪	·৬	·১	৮·৫
ম্যাওয়া	১৩·৮	১·৯	২·৫	৭০·৬
চকোলেট	৫·৯	১২·১	৪৮·৭	৩০·৩

ঘটকালির কথা

খাওয়া-দাওয়ার কথা বলতে গিয়ে মনে পড়লো একরকম ঘটকদের কথা, কেন না তাদের বাদ দিয়ে আমরা খাবার-দাবার হজম করতে পারিনে। আগে এই ঘটকদের ঘটকালি নিয়ে একটা ঘরোয়া পরীক্ষা করে দেখো।

দেশলাই-এর কাঠি জ্বালিয়ে একডেলা চিনি পোড়াবার চেষ্টা করো, দেখবে চিনিটা কিছুতেই পুড়তে চাইছে না। তার মানে, তাপ সত্ত্বেও চিনির সঙ্গে বাতাসের ভেতরকার অক্সিজেনের যোগাযোগ ঘটছে না—সেই যোগাযোগের নামই তো পুড়ে যাওয়া। কিন্তু চিনির ডেলাটাকে খানিকটা সিগারেটের ছাইয়ের মধ্যে চুবিয়ে নাও, তারপর আগুন ধরাও—দেখবে সেটা কী রকম বেমালুম পুড়ে যায়। আর বৈজ্ঞানিকেরা খুঁটিয়ে দেখেছেন যে এইভাবে চিনি পোড়াবার পর যেটুকু ছাই পড়ে রইলো সেইটুকুর মধ্যে থেকে সিগারেটের ওই ছাইটাকে সম্পূর্ণভাবে উদ্ধার করা সম্ভব। তার মানে, ব্যাপারটা হলো কী ? এমনিতে চিনির সঙ্গে অক্সিজেনের যোগাযোগ ঘটছিল না, অথচ সিগারেটের ছাই অনায়াসে ঘটিয়ে দিল সেই যোগাযোগ। শুধু তাই নয়; এই যোগাযোগ ঘটিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও সিগারেটের ছাইটুকুর কিছুই তফাত হলো না। আগে যেমন ছিল ঠিক তেমনই রইল। তাই, ব্যাপারটা অনেকখানি ঘটকালির মতোই নয় কি ?—ঘটক লাগিয়ে দিল বিয়েবাড়ি, কিন্তু ঘটকের নিজের তো বিয়ে হলো না।

এ-হেন যে-সব পদার্থ, যাদের ঘটকালি ছাড়া বিভিন্ন রকম পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক মিলন ঘটে না, তাদেরই বৈজ্ঞানিক নাম হলো ক্যাটালিটিক এজেন্ট।

আমাদের শরীরের মধ্যে খাবার-দাবার হজম হবার ব্যাপারে আর হজম-হওয়া খাবার পুড়িয়ে শরীরের জন্যে শক্তি যোগান দেবার ব্যাপারে হরেক রকম রাসায়নিক অদল-বদলের দরকার পড়ে। তার মধ্যে নানারকম অদল-বদলের জন্যে দরকার এই ধরনের ক্যাটালিটিক এজেন্ট বা

রাসায়নিক ঘটক। হজম হবার ব্যাপারে যে-সব রাসায়নিক ঘটকদের হাতযশ বেশ বেশি তাদের নাম হলো এন্‌জাইম্‌ বা enzymes। আমাদের শরীরের মধ্যে নানান রকম এন্‌জাইম দরকার—তারা নিজেরা বদলেও শরীরের মধ্যে নানান অদল-বদল সৃষ্টি করতে পারে। অবশ্য এদের কাণ্ডকারখানা নিয়ে যদি খুব খুঁটিয়ে আমাকে জেরা করতে শুরু কর তাহলে আমি বেজায় মুশকিলে পড়ব। শুধু একটি মজার ব্যাপার বলে এদের কথা শেষ করে দিই : এই সব রাসায়নিক ঘটক তৈরি করবার কারখানা আমাদের শরীরের মধ্যেই রয়েছে।

কারখানার নাম গ্লাণ্ড

শরীরের মধ্যে যে-সব কারখানা সেগুলোর নাম হলো গ্রন্থি বা গ্লাণ্ড। এই গ্লাণ্ডগুলোকে কারখানা বলছি কেন ? কেন না ঠিক কারখানার মতোই যে তাদের কাণ্ডকারখানা। কারখানাটিতে কী হয় ? বাইরের থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে তৈরি মাল বানানো হয়, এই তো ? বাজার থেকে তুলো এনে কাপড়ের কারখানায় তৈরি করে ফেললাম ধুতি, শাড়ি কিংবা বিছানার চাদর। গ্লাণ্ডদের বেলাতেও অনেকটা তাই। কেন না গ্লাণ্ডরাও রক্ত থেকে নানা রকম জিনিস সংগ্রহ করে আর তারপর সেই জিনিস থেকে তৈরি করে একেবারে নতুন ধরনের কিছু। এই নতুন যে জিনিসটা তৈরি হলো সেটা অবশ্য বাজারে বিক্রি করা হবে বলে নয়—শরীরের কাজে লাগবে বলেই এগুলোকে শরীরের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা। আমাদের শরীরের মধ্যে নানান রকম গ্রন্থি রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে নানান রকম জিনিস তৈরি করার ব্যবস্থা। সবগুলোতেই যে এন্‌জাইম্‌ তৈরি হচ্ছে তা নয়। কতকগুলো গ্রন্থির মধ্যে তৈরি হয় রকমারি এন্‌জাইম্‌। আর এই সব রকমারি এন্‌জাইমের সাহায্যে শরীরের মধ্যে রকমারি রাসায়নিক কাজ চালাবার ব্যবস্থা! কোনো এন্‌জাইম শরীরের মধ্যে কার্বোহাইড্রেট নিয়ে কায়দা করতে ব্যস্ত, কেউ আবার ফ্যাট নিয়ে, প্রোটিন নিয়ে কেউ হয়তো বা!

"আমি উত্তেজিত করি"

কিন্তু এ-ছাড়াও আরও এক রকমের গ্রন্থি বা গ্লাণ্ড আছে শরীরের মধ্যে। তাদের বলে এন্ডোক্রাইন (endocrine) বা নলীহীন গ্রন্থি। গ্রন্থি হিসেবে এগুলোও কারখানার মতোই : রক্তের মধ্যে থেকে কাঁচা মালমশলা সংগ্রহ করে আর তা থেকে তৈরি করে একেবারে নতুন ধরনের জিনিস। কিন্তু সাধারণ গ্রন্থির সঙ্গে তফাত হলো তৈরি মাল শরীরের কাজের জন্যে ফেরত দেবার কায়দায়। সাধারণ গ্রন্থিগুলো তৈরি মাল কী করে ফেরত পাঠায়? তাদের সঙ্গে লাগানো রয়েছে নল আর এই নলের মধ্যে দিয়ে তৈরি মাল শরীরের নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে পৌঁছোয়! যেমন ধরো, আমাদের কানের গোড়ায় রয়েছে প্যারোটিড্ বলে গ্রন্থি, তার ভেতরে তৈরি হচ্ছে লালা আর ওই গ্রন্থি থেকে নির্দিষ্ট নল বেয়ে লালাটা সোজাসুজি আমাদের মুখের মধ্যে এসে পড়ছে। এন্ডোক্রাইন গ্রন্থির বেলায় কিন্তু একেবারে অন্যরকম : তাদের সঙ্গে কোনো নলী লাগানো নেই আর তাই তাদের ভেতর যে-মাল তৈরি হয় সেই মাল তারা সোজাসুজি রক্তের মধ্যেই ছেড়ে দেয়। ফলে, তৈরি মালটা শরীরের শুধু কোনো একটি নির্দিষ্ট জায়াগাতেই গিয়ে পৌঁছোয় না, রক্তের সঙ্গে মিশে ঘুরতে বেরোয় পুরো শরীর।

আর এই সব এন্ডোক্রাইন গ্রন্থির মধ্যে যে মাল তৈরি হয় তার নাম দেওয়া হয়েছে হর্মোন বা hormone। নামটা নেওয়া হয়েছে গ্রীক ভাষার একটি শব্দ থেকে, সেই শব্দের মানে হলো : আমি উত্তেজিত করি। এমনতরো অদ্ভুত নাম কেন? কেননা, হর্মোন বলে এই জিনিস যে দারুণ তেজী; রক্তের সঙ্গে অতি সূক্ষ্ম পরিমাণে মিশলেও শরীরময় দারুণ অদলবদল আনে। শরীরের নানান জায়গায় নানান রকম এন্ডোক্রাইন গ্রন্থি রয়েছে। তাদের মধ্যে তৈরি হয় রকমারি হর্মোন আর সেই সব রকমারি হর্মোনদের রকমারি কীর্তিকলাপ। পাখিদের পালকের অমন আশ্চর্য রং আর তাদের গলার ওই আশ্চর্য সুর এর মূলে রয়েছে হার্মোনেরই কীর্তি। আমাদের শরীরের গড়ন আর বাড় অনেকাংশেই হর্মোনের ওপর নির্ভর করে। এমনকি আমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি, ভাবআবেগ অনেক কিছুর মূলেই আছে হর্মোন। গোটাকতক নমুনা দেখা যাক।

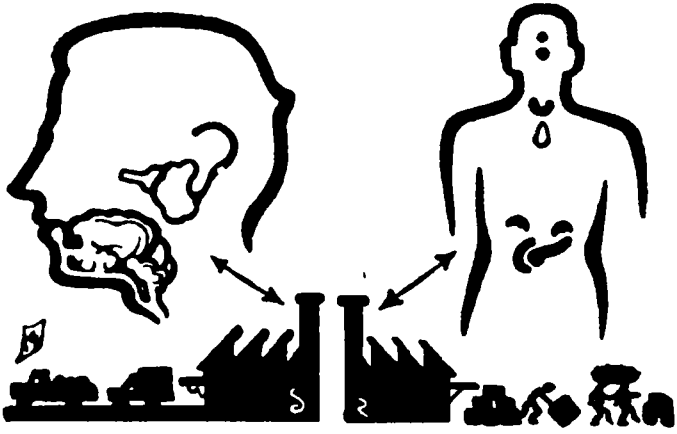

শরীরের গ্রন্থিগুলো কারখানার মতোই। তবে গ্রন্থি দুরকম ; বাঁ দিকে নলি-যুক্ত গ্রন্থির ছবি আর শরীরের কোথায় কোথায় এন্ডোক্রাইন গ্রন্থি আছে তার কিছু নমুনা ডানদিকে।

বামনের দেশ ?

তুমি যদি কিছুদিন আগে আল্‌প্‌স্‌ পাহাড়ে বেড়াতে যেতে তাহলে সেখানে প্রায়ই তোমার চোখে পড়ত এক রকমের বামন, যাদের কিনা নাম দেওয়া হয় ক্রিটিন (cretin)। তাদের চেহারা দেখলেই তুমি বুঝতে পারতে যে বয়েস বেড়ে চলা সত্ত্বেও তাদের শরীর-মন ঠিকমতো বেড়ে চলেনি, ছেলেবয়েসের কাছাকাছি কোথায় যেন খাপছাড়াভাবে থেমে গিয়েছে। সাধারণত গলার কাছে তাদের গলগণ্ড। এমনতরো বামন হিমালয়ের নানান জায়গাতেও প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু তুমি সমুদ্রের ধারের জায়গাগুলোয় ঘুরে বেড়াও, এ-রকম বামন বড়ো একটা চোখে পড়বে না। আর তুমি অবাক হয়ে ভাববে, এমন ব্যাপার কেন ?

হর্মোন আবিষ্কার হবার আগে পর্যন্ত এ প্রশ্নের জবাব সত্যিই কেউ জানত না। কিন্তু আজকাল জানতে পারা গিয়েছে। ব্যাপারটা কি জান ? আমাদের গলার কাছে থাইরয়েড্‌ বলে যে এন্ডোক্রাইন গ্রন্থি আছে তার কাজ যদি ঠিকমতো না হয়,—অর্থাৎ ঐ কারখানায় তৈরি হর্মোন যদি শরীরের রক্তে ঠিকমতো সরবরাহ না হয়,—তাহলেই এই দশা হবে। কিন্তু কারখানায় মালপত্তর তৈরি করবার জন্যে কাঁচামাল লাগে তো। থাইরয়েডের পক্ষে

কাঁচা মাল বলতে প্রধান হলো আইয়োডিন। এখন, সমুদ্রের ধারে জলটলের মধ্যে আইয়োডিনের প্রচুর যোগান, তাই ও রকম ক্রিটিন চোখে পড়বার কথা নয়। সমুদ্রের থেকে বহুদূরের পাহাড়ে আইয়োডিনের যোগান বড় কম, তাই থাইরয়েডের পক্ষে হর্মোন তৈরি করার অসুবিধে আর তাইই অতো ক্রিটিন। আজকাল ডাক্তাররা তাই ব্যবস্থা করছেন যাতে ওসব দেশে পাতে খাবার নুনের সঙ্গেই সামান্য আইয়োডিন মিশিয়ে দেওয়া হয়।

অবশ্য মনে রাখতে হবে, যে-কোনো দেশের যে কোনো মানুষেরই নানান কারণে থাইরয়েড বলে এই এন্ডোক্রাইন গ্রন্থি বিকল হতে পারে। আর তাই যে-কোনো দেশেই পাহাড়ী বামনদের মতো চেহারাওয়ালা মানুষ দেখতে পাওয়া সম্ভব। তবে থাইরয়েডের রহস্য শিখতে পারবার পর বৈজ্ঞানিকেরা আর ও-রকম চেহারা দেখলে ঘাবড়ে যান না, থাইরয়েডের চিকিৎসা করে মানুষের চেহারাকে চেহারাই বদলে দিতে পারেন।

দৈত্যদের কথা

আমাদের মাথার খুলির ভেতর মগজ। তারই নিচের দিকটায় মটরশুঁটির মতো ছোট্ট এতোটুকু একটি এন্ডোক্রাইন গ্রন্থি আছে, তার নাম হলো পিটুইটারি গ্রন্থি। তাকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা হয়। সামনের ভাগটা (anterior lobe) থেকে অন্তত ছ'রকমের রকমারি হর্মোন তৈরি হয়। এর মধ্যে একটা হর্মোনের ওপর নির্ভর করছে আমাদের শরীরের বাড়, তাই তাকে বলে বাড়ের হর্মোন। আর বাড়ের বয়েস কাকে বলে জানো তো? আমাদের শরীর একটা বিশেষ বয়েস পর্যন্ত বড়ো হতে থাকে, তারপর আর বড়ো হয় না। এই বয়েসটা পর্যন্ত হলো বাড়ের বয়স। এখন ব্যাপার কী জান? এই বাড়ের বয়েসটার মধ্যে পিটুইটারি গ্রন্থির ওই অংশ থেকে যদি কোন কারণে বাড়াবাড়ি পরিমাণে বাড়ের হর্মোন তৈরি হতে থাকে তাহলে আমাদের শরীর বাড়তে বাড়তে একেবারে দৈত্যের মতো হয়ে যাবে। সার্কাস দলে যে-সব দৈত্যের মতো বিরাট চেহারার লোক দেখতে পাও তাদের আসল রহস্য আর কিছুই নয়। তাই এদের নাম দেওয়া হয়

পিটুইটারি দৈত্য। কিছুকাল আগে এক ফরাসী জমিদারের খেয়াল চেপেছিল, খুঁজে খুঁজে এইরকম দৈত্য ছেলেদের সঙ্গে দৈত্য মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার—জমিদারের ধারণা, এতে তাদের ছেলেপুলেরাও দৈত্যের মতো বড় হবে। অনেক লক্ষ টাকা খরচ করে জমিদার মশাইয়ের খেয়াল তো মেটানো হলো। কিন্তু, ও-হরি, দেখা গেল দৈত্য আর দৈত্যনীদের ছেলেপুলেরা সাধারণ মানুষের মতোই হচ্ছে যে! আর তা তো হবারই কথা। কেননা, দৈত্য হবার রহস্যটা তো আসলে পিটুইটারি গ্রন্থির পক্ষে অসুস্থ হয়ে পড়াই — অস্বাভাবিক রকমের বেশি হর্মোন উৎপাদন করা। তাই এর সঙ্গে বাবা-মার চেহারার সম্বন্ধ থাকবে কেন?

কিন্তু বাড়ের বয়েসে যদি এই গ্রন্থি উল্‌টো কাজ করতে শুরু করে? অর্থাৎ, তার থেকে যদি হর্মোন উৎপাদন অস্বাভাবিক ভাবে কমে যায়? তাহলে দৈত্য হবার বদলে বামন হবার কথা। কিন্তু এই বামনেরা থাইরয়েড্ ঘাটতির দরুন যে-ক্রিটিন তাদের মতো নয়। পিটুইটারি-বামনদের স্বাভাবিক বুদ্ধিশুদ্ধি থাকে, তাদের চেহারাও কুৎসিত হয় না।

জানের দায়ে

জানের দায়ে কখনও ছুট দিয়েছ? যদি দিয়ে থাক তাহলে নিশ্চয়ই জান, স্বাভাবিক অবস্থায় এমন জোরে দৌড়নো কিছুতেই সম্ভবপর নয়। কিংবা

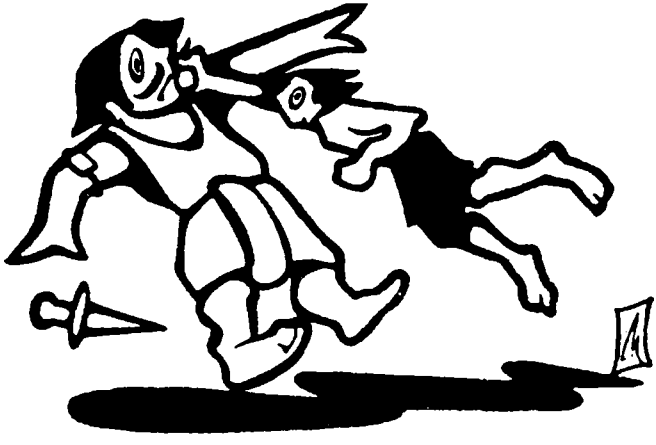

ধর, কোণঠাসা বেড়ালটার কথা। কিংবা যাকে আমরা বলি মরিয়ার মতো লড়া। এ-সব সময়ে আমাদের শরীরের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক শক্তির যোগান হয়। কোথা থেকে যোগান হয়? আকাশ থেকে নয়; তার বদলে বলতে পার আমাদেরি পেটের ভেতর থেকে। কেননা আমাদের পেটের মধ্যে আছে এ্যাড্রিন্যাল নামে একজোড়া এন্ডোক্রাইন গ্রন্থিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়, এক ভাগকে বলতে পার ওপরের খোসা (crotex), আর এক ভাগকে বলতে পার ভেতরকার শাস (medulla)। এই দুই অংশ থেকে আলাদা আলাদা রকমের হর্মোন তৈরি হয়। তার ভেতর একটি হর্মোনের নাম হলো এড্রিন্যালিন — ভেতরকার ওই শাঁস অংশের মধ্যে তা তৈরি হয়। বিপদ-আপদের সময়ে বেড়ে যায় এই হর্মোন উৎপাদনের হার আর ওই এড্রিন্যালিন নামে হর্মোনই আমাদের শরীরের মধ্যে এমন সব গভীর পরিবর্তন নিয়ে আসে যার দরুন আমরা ওই রকম মরিয়ার মতো একটা কিছু করে বসতে পারি, — যোগান হয় ওই অস্বাভাবিক ক্ষমতার!

কিন্তু কেন?

তাহলে স্বাভাবিক অবস্থায় শরীরের মধ্যে যেটুকু পরিমাণ এ্যাড্রিন্যালিনের সরবরাহ, বিপদ-আপদের সময় তার চেয়ে ঢের বেশি। তাই প্রশ্ন হলো, এই কম-বেশির তফাত হয় কেন? এ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থির ভেতরকার অংশটা কার তাঁবেদারিতে কাজ করে? স্নায়ুতন্ত্রের। তার মানে, এ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থির সঙ্গে যোগ আছে স্নায়ুর। শরীরের ভেতরকার স্নায়ুগুলো টেলিগ্রাফের তারের মতো। কেননা, এই স্নায়ুগুলোর ভেতর দিয়েই শরীরের মধ্যে খবরাখবর আনাগোনা করে। তাই, বিপদ-আপদের সময় স্নায়ুর মধ্যে দিয়ে এ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থির কাছে যেন হুকুম আসে : প্রাণপণে কাজ চালাও, তৈরি হোক প্রচুর পরিমাণে এ্যাড্রিন্যালিন! কিন্তু তাই বলে সমস্ত এন্ডোক্রাইন গ্রন্থি এ-রকম ভাবে স্নায়ুতন্ত্রের তাঁবেদারি করতে বাধ্য নয়। তবে এ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থির ভেতরকার ওই অংশটা যে স্নায়ুতন্ত্রের হুকুমেই কাজ করে তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে! যে-স্নায়ুর সঙ্গে তার

যোগ সেই স্নায়ুটাকে কেটে দিলে গ্রন্থিটা অকর্মণ্য হয়ে যায়। তাছাড়াও, বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করে দেখেছেন ওই স্নায়ুটাকে রকমারি ভাবে তাতিয়ে-পুতিয়ে গ্রন্থিটাকে দিয়ে রকমারি পরিমাণে হর্মোন উৎপাদন করানো সম্ভব।

শরীরের ভেতর টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা

তাহলে এবারে এসো, স্নায়ুতন্ত্রের কথাটা একটু খতিয়ে দেখা যাক।

আমাদের মাথার খুলির মধ্যে রয়েছে সাদাটে আর নরম মতো একতাল জিনিস, তারই নাম ব্রেন (brain) বা মগজ। এই মগজের যেন একটা শেকড় নেমে গিয়েছে শিরদাঁড়ার ভেতরকার সুড়ঙ্গর মধ্যে দিয়ে; শেকড়টাকে বলে স্পাইন্যাল কর্ড (spinal cord) বা সুষুমা। এই ব্রেন আর স্পাইন্যাল কর্ড থেকে অজস্র সাদা-সাদা ডালপাতার মতো জিনিস বেরিয়ে ছেয়ে রয়েছে সমস্ত শরীরটা। এই ডালপালাগুলোকেই বলে নার্ভ (nerve) বা স্নায়ু। স্নায়ুতন্ত্রের চেহারা বলতে ওই ব্রেন, স্পাইন্যাল কর্ড আর নার্ভ-ই।

শরীরের প্রত্যেকটি তন্ত্রের মূলেই শেষ পর্যন্ত রয়েছে জীবকোষ। স্নায়ুতন্ত্রের বেলাতেও তাই। যে সব জীবকোষ মিলে গড়ে তুলেছে এই স্নায়ুতন্ত্র তাদের নাম হলো নিউরোন (neurone)। সব নিউরোনের চেহারা অবশ্য হুবহু এক রকমের নয়; তবু সাধারণভাবে তাদের সবাইকার চেহারার মধ্যে মিল আছে। মাঝখানে তার কেন্দ্র আর দু'পাশে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ডালপালা বেরিয়েছে যেন। তার মানে, মাথার খুলির ভেতরকার ব্রেন শিরদাঁড়ার ভেতরকার স্পাইন্যাল কর্ড আর শরীরের ওই অতো অজস্র নার্ভ — সবাই শেষ পর্যন্ত এ-হেন নিউরোনের তালগোল বিশেষ। অবশ্য একটা নিউরোনকে যদি আলাদাভাবে আর ভালো করে দেখতে চাও তাহলে অণুবীক্ষণ যন্ত্র লাগবে। কিন্তু হাজার হাজার নিউরোন মিলে দড়া পাকিয়ে যে-নার্ভ তৈরি করে তাকে দেখবার জন্যে অনুবীক্ষণের দরকার নেই। কায়দামাফিক শরীরকে কাটাকুটি করলে দেখতে পাবে কোন নার্ভ

গুলিসুতোর মতো, কোনটা বা টোন সুতোর মতো, কোনটা এমন কি বেশ রোগাসোগা দড়ির মতোই মোটা।

নিউরোন দিয়ে গড়া এ-হেন যে স্নায়ুতন্ত্র একে মোটের ওপর টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করা হয়। টেলিগ্রাফ ব্যবস্থাটা কী রকম? ধর, মাজদিয়া স্টেশনের কাছে ঘটল দারুণ ট্রেন-দুর্ঘটনা; টেলিগ্রাফের তার বেয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খবরটা চলে এলো কলকাতা শহরে, কলকাতা শহর থেকে আবার টেলিগ্রাফের তার বেয়ে খবর চলল খড়গপুরে, সেখান থেকে বড় বড় কপিকল আর এঞ্জিন ছুটল মাজদিয়ার দিকে — উলটে-যাওয়া রেলগাড়িগুলোকে টেনে তোলবার জন্যে।

তোমার শরীরের মধ্যেও এই রকমই : ধর, তোমার হাতের ওপর একটা বোলতা হুল ফুটিয়ে দিল, সেখান থেকে হুল ফোটাবার খবর চলল নার্ভ বেয়ে স্পাইন্যাল কর্ডের দিকে; স্পাইন্যাল কর্ডের যে জায়গায় এই খবরটা পৌঁছাল সেখান থেকে আর একটা নার্ভ বেরিয়ে এসেছে তোমার হাতের পেশী পর্যন্ত। এই নার্ভ বেয়ে পেশীটার কাছে হুকুম এল : নিজেকে কুঁকড়ে গুটিয়ে নাও। আর পেশীটা নিজেকে গুটিয়ে নেবার সঙ্গে সঙ্গেই সড়াত করে সরে যাবে তোমার হাত। অবশ্য, এখানে খবরটা আর ব্রেন পর্যন্ত

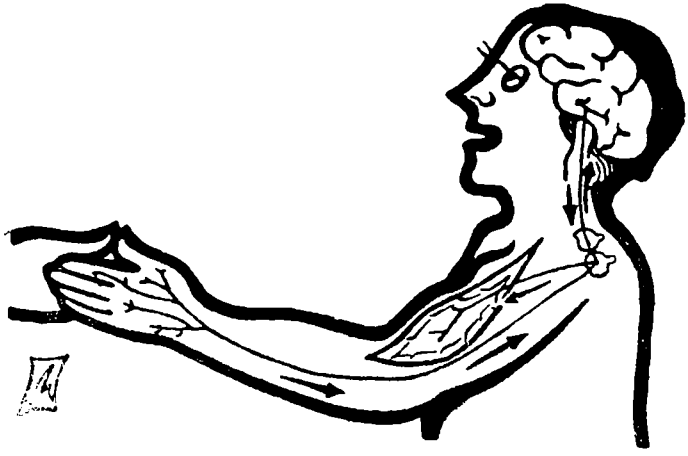

পৌঁছুল না। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই অন্যরকম : নার্ভ বেয়ে একটা খবর স্পাইন্যাল কর্ড পর্যন্ত পৌঁছুবার পর আবার স্পাইন্যাল কর্ড থেকে অন্য নিউরোন বেয়ে খবরটা শেষ পর্যন্ত ব্রেনে পৌঁছোয় আর ব্রেনই শরীরের নানান জায়গায় হুকুম পাঠিয়ে ঠিক করে দেয় কোন অবস্থায় শরীরের কোন অঙ্গ কী ব্যবস্থা করবে।

তাহলে দেখতেই পাচ্ছ, নার্ভ আসলে দুরকমের। একরকম নার্ভ বেয়ে খবর চলে শরীরের ভেতর দিকে অর্থাৎ স্পাইন্যাল কর্ড আর এক রকম নার্ভ বেয়ে খবর আসে শরীরের ভেতর দিক থেকে বাইরের দিকে, অর্থাৎ ব্রেন আর স্পাইন্যাল কর্ড থেকে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের দিকে। যে-নার্ভগুলো দিয়ে খবর চলে ভেতর-মুখো সেগুলোকে বলে এ্যাফারেন্ট (afferent) নার্ভ, আর যেগুলো দিয়ে খবর আসে ভেতর থেকে বাইরের দিকে সেগুলোকে বলে এফারেন্ট (efferent) নার্ভ। কিন্তু খবর যে-মুখেই চলুক না কেন, নার্ভের দশা ওই টেলিগ্রাফের তারের মতোই : তার এক প্রান্তে ঠোকা হচ্ছে টরে-টক্‌কা আর অন্য প্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছে খবরটা। তাই বলে অবশ্য, নার্ভগুলোকে একেবার হুবহু টেলিগ্রাফের তারের মতো মনে করলেও ভুল করা হবে। প্রথমত, টেলিগ্রাফের তারের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলে বিদ্যুৎ অথচ নার্ভের মধ্যে দিয়ে যে-জিনিসটি বয়ে চলে তা অনেকটা বিদ্যুতের মতো হলেও বিদ্যুতের সঙ্গে তফাত দেখা যায়। যেমন ধর, তারের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুতের গতি হলো আলোর গতির সমান : অর্থাৎ কিনা এক সেকেন্ডে একশো ছিয়াশি হাজার মাইল। অথচ, নার্ভের মধ্যে দিয়ে যে খবর যাতায়াত করে তার গতি এক সেকেন্ডে মাত্র ৭৫ গজ। তাছাড়াও টেলিগ্রাফের তারটা জড় পদার্থ, তাই তার মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ বয়ে গেলেও এ ব্যাপারে তার নিজের পক্ষে করবার কিছুই নেই। কিন্তু নার্ভগুলো জীবকোষের সমষ্টি, অর্থাৎ জীবন্ত জিনিসই। তাই তাদের মধ্যে দিয়ে খবর বয়ে যাবার ব্যাপারে তাদের নিজস্ব অবদানও রয়েছে যেমন :

আমরা যে অষ্টপ্রহর নিঃশ্বাস নিচ্ছি আর প্রশ্বাস ফেলছি তার মূলেও রয়েছে স্নায়ুতন্ত্রের কেরামতি।

নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসের রহস্য

নিঃশ্বাস আমরা কেন নিই বলতে পার ? তুমি হয়ত বলবে, এ আর এমন শক্ত প্রশ্ন কী হলো? শরীরের জন্যে দরকার অক্সিজেন, বাইরের বাতাসে সেই অক্সিজেনের যোগান; তাই আমরা ফুসফুস ভরে বাইরের বাতাস টেনে নিলাম আর ফুসফুসটা বাতাস থেকে অক্সিজেন ছেঁকে নিয়ে চালান করে দিল রক্তের মধ্যে। তার মানে, জীবকোষদের জন্যে দরকার অক্সিজেন আর তারই খাতিরে নিঃশ্বাস নেওয়া।

আসলে কিন্তু এমনতর কথা বললে ভুল হবে। কেননা, আমরা যে শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছি তা আসলে অক্সিজেনের টানে নয়, কার্বন-ডাই-অক্সাইডের তাড়নায়। ব্যাপারটা খুলে বলি। আমাদের শরীরের মধ্যে সব সময়েই তৈরি হচ্ছে কার্বন-ডাই-অক্সাইড — কেননা আমাদের রক্ত শরীরের প্রতিটি জীবকোষের কাছে বয়ে নিয়ে চলেছে খাবার-দাবার আর অক্সিজেন, আর প্রতিটি জীবকোষই খাওয়া-দাওয়ার পর ছিবড়ে কিংবা এঁটোকাঁটা হিসেবে রক্তের মধ্যে ফিরিয়ে দিচ্ছে কার্বন-ডাই-অক্সাইড।

তাহলে রক্তের মধ্যে সব সময়েই জমা হচ্ছে কার্বন-ডাই-অক্সাইড। আর তাই রক্তের স্রোতের সঙ্গে কার্বন-ডাই-অক্সাইডও শরীরের মধ্যে ঘুরতে বেরোয়। ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়ে মগজের ভিতরে। এখন, এই মগজের নিচের দিক বরাবর একটা অংশ আছে, যার নাম হলো কিনা মেডুলা (medulla)। আর মেডুলা বলে মগজের ওই অংশটা কার্বন-ডাই-অক্সাইডের আঁচ একেবারে সইতেই পারে না। তাই, রক্তের মধ্যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড একটু বেশি জমে গেলেই মেডুলাটা যেন ক্ষেপে যায়, ক্ষেপে গিয়ে বুকের পাঁজরার আর বুকের নিচের দিকের পেশীকে হুকুম পাঠায় : এখুনি নিজেদের শরীর কুঁচকে ফেলো। আর বুকের ভেতর এমনই ব্যবস্থা যে ওই পেশীগুলো নিজেদের শরীর কুঁচকে ফেললেই ফুসফুসটা যাবে চুপসে আর ফুসফুসটা চুপসে গেলেই তার ভেতরকার হাওয়ার সঙ্গে শিরা দিয়ে আসা কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মিশেলটা প্রশ্বাস হয়ে বুক থেকে বেরিয়ে যাবে। তারপর বুকের ওই পেশীগুলো যেন হাত-পা এলিয়ে নিজেদের একটু বিশ্রাম দিতে চাইবে, সেই ফাঁকে ফুলে উঠবে ফুসফুসটা

আর ফুসফুসটা ফুলে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে বাইরের হাওয়া হুড়মুড় করে তার মধ্যে ঢুকে পড়বে। কিন্তু আবার রক্তের মধ্যে যেই একটু বেশি কার্বন-ডাই অক্সাইড জমলো অমনি মেডুলা গেল ক্ষেপে, মেডুলার কাছ থেকে স্নায়ুরা আবার হুকুম নিয়ে চললো বুক আর পেটের কাছ-বরাবর পেশীদের কাছে, তারা নিজেদের শরীর কুঁচকে দিয়ে চুপসে দিল ফুসফুসকে।

হাঁফিয়ে পড়ার রহস্য

এক দৌড়ে এক চক্কোর ঘুরে এলুম আর তারপর ফোঁসফোঁস করে হাঁফাতে লাগলাম। কিন্তু কেন? ব্যাপারটা কী? ব্যাপারটা আসলে খুব সোজা। দৌড়বার সময় শরীরের জন্যে খুব বেশি শক্তির যোগান দেওয়া দরকার পড়েছিল আর তাই শরীরের জীবকোষেরা রক্তের মধ্যেকার চিনি

বেশ্যার পরিমাণে পুড়িয়েছে। ফলে তৈরি হয়েছে অঢেল কার্বন-ডাই অক্সাইড। আর এই কার্বন-ডাই-অক্সাইডের জ্বালায় পড়ে মেডুলাটা বুকের পেশীদের কাছে ঘন ঘন হুকুমদারি করেছে; ফুসফুস চুপসে বিদেয় কর কার্বন-ডাই অক্সাইড। আর এতো সব ব্যাপারের ঠেলায় পড়ে আমি বেচারা হাঁফিয়ে মরছি।

এসো, তোমায় একটু বোকা বানিয়ে দিই

চল দুজনে একটা পুকুরে যাই আর কমপিটিশান দিয়ে দেখা যাক কে বেশিক্ষণ ডুব দিয়ে থাকতে পারে। আমি কিন্তু বলে রাখছি, আমি চালাকির কায়দা জানি। ডুব গালবার আগে আমি বেশ আট দশবার খুব বুক ভরে ভরে নিঃশ্বেস নেব আর বার করে দেবো প্রশ্বাস। ফলে সাধারণ অবস্থায় রক্তের মধ্যে যে পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড জমানো থাকে আমার রক্তের মধ্যে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ তার চেয়েও কমে যাবে। তারপর ডুব গেলে থাকবার সময়ে মেডুলাকে একেবারে অস্থির করে দেবার মতো পরিমাণ কার্বন-ডাই অক্সাইড রক্তের মধ্যে জমতে বেশ খানিকক্ষণ সময় লাগবে।

মূল্য : ১৫ টাকা